মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব

মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব
মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার

মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার ১৯৬১ সালে নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডস্থ খন্দকার নগর, মাইজদীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী মোঃ মোমেন উল্ল্যা খন্দকার, মাতা মহিনুর বেগম। তিনি ১৯৭৫ সালে নোয়াখালী জিলা স্কুল থেকে এস.এস.সি ও ১৯৭৭ সালে নোয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা) থেকে স্নাতক ও ইতিহাস বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। মোজাম্মেল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য। ইতোমধ্যে তার লেখা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু "শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরনীয় কর্মময় জীবন" এবং "ব্যাংকিং কার্যক্রম ও পর্যালোচনা" নামক দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি একজন ব্যাংকার ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান।

মোজাম্মেল হোসেন খন্দকারের পিতা মরহুম হাজী মোঃ মোমেন উল্ল্যা খন্দকার একজন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বঙ্গবন্ধুর সহচর্য লাভ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। ৭১ এর ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহে নোয়াখালী শহর মুক্ত করার সময় তাঁর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালী জেলার মাইজদীতে পাক-বাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচার ও নোয়াখালী জেলার সদর হাসপাতালের পূর্ব উত্তর কোনায় গণ কবর নিজ চোখে দেখেছেন এবং ১৯৭২ সালের ২২ জুন নোয়াখালী জেলার শহীদ ভুলু ষ্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর বিশাল জন সভায় উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। উক্ত জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন এবং এক ইঞ্চি জমিও খালি না রাখতে সকলকে অনুরোধ জানান।

মোজাম্মেল হোসেন ভুলতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর সে আহবান। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্নত্যাগ ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে স্বপরিবারে হত্যা করেছে। যা আজও তিনি মেনে নিতে পারেননি আর এ সবই স্বমহিমায় স্থান করে নিয়েছে এই বইটিতে।

প্রকাশক

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব ❑ মো. মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার
স্বত্ব লেখক
প্রথম প্রকাশ : ২০১৪
প্রকাশক : শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৬১১-৯০৬০৪০,
ই-মেইল: parijat1999@gmail.com
প্রচ্ছদ : মোস্তফা কাদের
অমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন
আগরতলা পরিবেশক : মৌমিতা প্রকাশনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
রকমারিডট.কম
বাংলাদেশ পরিবেশক : খাজা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫৮, বনগ্রাম রোড, ঢাকা।
প্রমিজ লাইব্রেরি, বড় মসজিদ রোড, মাইজদী, নোয়াখালী।
বর্ণবিন্যাস গাউছিয়া ডিজাইন হাউজ, ৮৬ যোগীনগর, ওয়ারী, ঢাকা
মুদ্রণে : হোসাইন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং (প্রা:) লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : আরাফা নিলয় এ্যাপার্টমেন্ট এনডাব্লিউ ৪ (৪র্থ তলা)
হাউজ # ১৬, রোড # ১০, গুলসান-১, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৯৮৮১৫৮১
ই-মেইল akram_hossain90@yahoo.com

মূল্য ২৫০ টাকা

MOKTIJODDAH O BANGABANDHU GHOSITO DHITIO BIPLOB
by Md. Mozzammal Hossain Khandakar
Published by Showkat Hossain Litu
Parijat Prakashani, 68-69 Pyaridas Road, Dhaka-1100
Phone : 95756, e-mail parijat1999@gmail.com
U.S.A Distributor : Muktadhara, Jackson Heights, New York
U.K. Distributor Sangeeta Limited, 22 Brick Lane, London E1 6RF
Agartala Distributor Moumita Prakashani, Agartala, West Tripura
Bangladesh Distributor : Promise Libarary, Boro Mosjid Road, Maijdee, Noakhali
First Published 2014
Price : Taka 250 Only
ISBN 978-984-507-106-2

উৎসর্গ

নোয়াখালী জেলার জনপ্রিয় সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর পিতা ও বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সহচর দানবীর **হাজী মোঃ ইদ্রীস** এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গবন্ধুর প্রতি আজো যাদের প্রাণ কাঁদে এবং আমাকে যারা প্রেরণা যুগিয়েছেন তার মধ্যে **বিপুল সাহা**, ডিজিএম, নিউ টাউন নিটওয়্যার কোং লিঃ, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

বাণী

মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা
উপ মহাব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব" বইটিতে বাঙালী জাতির ইতিহাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরনীয় অবদানের কথা মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকারের হাতের ছোঁয়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে "দ্বিতীয় বিপ্লব" এর ঘোষনা দিয়েছিলেন তা তাঁকে সম্পন্ন করতে দেয়া হয়নি এমনকি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র তাকে যেভাবে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে তা লেখককে পীড়িত করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একজন ধারক হিসাবে শিক্ষার্থী, তরুন সমাজ ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। তার প্রকাশিত বইয়ের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন, যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তার মুক্তি এবং তাঁর চেতনায় ও লেখক সত্ত্বায় বিষয়গুলো জুড়ে রয়েছে। এ কারণে ১৭৫৭ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাসের সকল ক্রীনড়ক ঘটনার তিনি স্বকীয় ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষন করে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ গ্রন্থে লেখক তার আলোচনায় দেখিয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে হয়তো বাংলাদেশ এখনও স্বশাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত না। আমরা কেউ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিকের আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে পারতাম না। স্বাধীনতার স্থপতির মর্মান্তিক মৃত্যুকে তাই তিনি অন্য সমস্ত বাঙালী ও বিশ্ববাসীর মতো কখনই মেনে নিতে পারেন নি।

ইতোমধ্যে তার **"জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরনীয় কর্মময় জীবন ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিদেশীদের মতামত"** বইটির পাশাপাশি ব্যাংকার হিসাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ দিক নিয়ে লেখা **"ব্যাংকিং কার্যক্রম ও পর্যালোচনা"** বইটি ব্যাংকারদের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অনেকটা সহজতর করেছে।

পাঠক সমাজে আমাদের সহকর্মী খন্দকারের গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি আদৃত হবে এ প্রত্যাশা করি এবং তার লেখনির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

(মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা)

বাণী

অধ্যাপক মোঃ হানিফ
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক
গণপরিষদ সদস্য ও
প্রাক্তন সংসদ সদস্য
নোয়াখালী

'৭৫ পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা বিরোধী একটি মহল, বাংলাদেশের সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে স্বাধীনতার ইতিহাস ও আমাদের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের কথা, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তদান ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়তে হলে, বর্তমান প্রজন্মকে গড়তে হবে বাঙালী জাতিয়তাবাদের চেতনায়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশপ্রেমিক বাঙালী হিসেবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তি ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে সচেতন থাকা এখন সময়ের দাবি। বঙ্গবন্ধু একটি ইতিহাস, একটি প্রতিষ্ঠান, যার জন্ম না হলে বাঙালী জাতি হয়তো আজো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেত না। বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা তাকে গণমানুষের প্রিয় নেতা হতে বাঙালী জাতির পিতা হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। সেই মহৎ আর বিশাল হৃদয়ের মানুষটির প্রথম **বিপ্লব মুক্তিযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিপ্লব** অর্থাৎ বাঙালী জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষিতের গণতন্ত্রের কথা অত্যান্ত সু-নিপুন দক্ষতায় মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার **"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব"** নামক গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়, মোজাম্মেলের পিতা হাজী মোঃ মোমেন উল্ল্যা খন্দকারের সাথে ১৯৫৬ সালে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে কাজ করতে করতে পরিচিত হই। তিনি ছিলেন আওয়ামীলীগের রাজনীতির একনিষ্ঠ বিশ্বাসী একজন শিক্ষিত মানুষ ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে তিনি যেভাবে আমাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিতেন তা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। আটান্নর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ও ৬ দফা সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে আমাদের পরিচালনা করেছেন। মোমেন উল্ল্যাহ খন্দকার চাকরিরত থাকা সত্ত্বেও নিজ পরিমণ্ডলে একজন আওয়ামীলীগার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাঙালীর স্বাধীনতার সক্রিয় সমর্থক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে সহয়তা দিয়ে তিনি ও তাঁর পরিবার অনেক নিগ্রহ ভোগ করেছেন। তাঁর ছেলে মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার **"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব"** নামক বইটি লেখায় আমি আনন্দিত ও গর্বিত। এর সাথে সাথে তার রচিত পুস্তকটির সাফল্য কামনা করছি।

(অধ্যাপক মোঃ হানিফ)

ভূমিকা

একটি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় দিক এবং সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হলো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির অধিকারী বাঙ্গালী জাতি। এই অর্জনের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দীর্ঘ দিনের আত্মত্যাগ সংগ্রাম ও নেতৃত্ব। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে অনেক বিকৃত ইতিহাস লেখা হয়েছে। ইনডেমনিটির অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিচার বন্ধ রাখা হয় দীর্ঘদিন। আর এ দীর্ঘ বছরগুলোতে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকুরি দেওয়া হয়েছিল খুনিদেরকে। অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এসে ইনডেমিনিটি বিল বাতিল করে খুনিদের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ১৩ বছর ধরে চলে বিচারকার্য। অবশেষে ২০০৯ সালে ১৯ নভেম্বর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ মামলার বিচার কার্যের চূড়ান্ত নিস্পত্তি ঘটে। এবং ২০১০ সালে ২৯ জানুয়ারি ১২ জন ফাঁসির আসামির মধ্যে ৫ আসামি ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ এর মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধানের মূলনীতি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

যার জন্ম না হলে আমরা স্বাধীনতা দেখতাম না, তার এই নৃশংশ হত্যাকান্ড তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য ভিত্তিক বর্ণনা এবং তখনকার পত্রপত্রিকা ম্যাগাজিনে সূত্র ধরে "মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব" ও বাকশাল গঠনের নেপথ্যে যে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কার্যকর নিহিত ছিল তার পটভূমিকা ও কর্মসূচির বিভিন্ন দিকসহ বইটিতে মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা পন্ডিত রবিশঙ্কর, জর্জ হ্যারীসন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও রক্ষী বাহিনী গঠনের পটভূমিকাসহ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে সাক্ষীর জেরা এবং খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকরের কাহিনী নিয়ে লেখা।

২০১০ সালে *"জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবিস্মরণীয় কর্মময় জীবন ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিদেশীদের মতামত"* নামক বইটি লেখার পর ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এবং মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম জানতে চায়। একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনকের উপর বই লেখার। এই বইটি অনেক বেদনাদায়ক। ১৯৭৫ পরবর্তী সরকারের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করেছি। মুক্তিযুদ্ধও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য দেশকে এক হিংসাত্মক অরাজকতার দিকে নিয়ে যায়। দেশ হয়ে উঠে মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অভয় অরণ্য। এর থেকে পরিত্রান পেতে হলে জাতীয় নেতৃবৃন্দের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শোষীতের গণ-তান্ত্রীক ভাবধারায় দেশকে পরিচালিত করলে এই দেশ গড়ে

উঠবে সুখী সমৃদ্ধশালী এক রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চ এর দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ ও ১০ জানুয়ারির ভাষণ বুঝতে হবে। যা আমাদের মুক্তির সনদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের শত সহস্র জটিলতা, স্বাধীনতাবিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের ধ্বংসাত্মক, হিংসাশয়ী অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক অপতৎপরতা, ১৯৭৪ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে অভূতপূর্ব বন্যায় খাদ্য সংকট, ক্রমবর্ধমান মজুতদারী, ফটকাবাজী ও আমদানি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। ১৯৭৪ সালের ডোনারকান্ট্রি ও পুঁজিবাদি রাষ্ট্রের নিকট হতে তরিৎ সাহায্য প্রাপ্তির আশায় ব্যক্তিগত খাত ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছুটা ছাড় ও সুবিধা প্রদান করার পরও আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ক্রীতখাদ্য পাঠাতে অহেতুক দেরি করায় প্রায় ২৫ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক চক্রান্তের মারপ্যাঁচে বঙ্গবন্ধু হতবাক হন।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ চাপ ও অসৌজন্যমূলক আচরণের চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে একক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এক আমূল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত একক জাতীয় দল বাকশালের উত্তরণের পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়, আমলাতন্ত্র মুক্ত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণ, জন্ম নিয়ন্ত্রন ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার মতো কর্মসূচি এবং সর্বোপরি শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। যার লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভরতা অর্জন, আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। কিন্তু বাঙালী জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি এবং উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) ঘোষণা ও গঠন করলে স্বাধীনতা বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মার্কিন সম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশকে সমাজ প্রগতির ধারা হতে প্রতিক্রিয়া ধারা ফিরিয়ে নেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব এবং বাকশালের কর্মসূচিকে প্রতিনিয়ত অপপ্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছে। কারণ ঐ কর্মসূচি সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম অবগত নয়।

বইটিতে কোনো তথ্য বা বানানের ভুলক্রটি থাকলে পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি।

মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার
khondakar.mozzammal@gmail.com

সূচীপত্র

১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বানিজ্যের নামে ভারত বর্ষে এসে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এবং মীর জাফরের বিশ্বাস ঘাতকতায় ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের পর বৃটিশরা দু'শো বছর আমাদের শাসন করেছে। পরাধীন ভারতের সকল মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ১৯৪৬ এর শেষের দিকে ভারতের রাজনীতিতে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়াই বৃটিশ সরকার বদ্ধ পরিকর। যে কোনো মতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হলো ভারত বর্ষ ভাগ হবে। অখন্ড ভারত অবশেষে খন্ডিত হয়ে স্বাধীন হলো। বৃটিশরা বিদায় নিলো। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান আর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা এলো। আমরা পাকিস্তানি রাষ্ট্রের কাঠামোতে স্বাধীনতা পেলাম। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থানেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং দীর্ঘ পথের দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে। শুধু মাত্র ধর্মীয় অনুভূতিকে ভিত্তি করে আমরা একই রাষ্ট্রের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হলাম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সাফল্যে জাতীয় চার নেতার সঙ্গে আনন্দমুখর বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী সর্ব প্রথম বাঙ্গালী জাতির ভাষা, সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যা প্রতিহত করতে ১৯৫২ সন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বীরত্বগাথা অধ্যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল রক্তাক্ত অধ্যায়ের গৌরবগাথা ইতিহাস গড়ে উঠে। ভাষা আন্দোলনের রেশ ধরেই এলো ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মোর্চার কাছে পরাভূত হলো পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর সমর্থিত মুসলীম লীগ। কিভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করা যায়। সে লক্ষে জনতার শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হয়। জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা থেকে জেনারেল আইয়ুব খান ক্রমান্বয়ে ক্ষমতার নিকটে চলে আসে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে ঘোষণা করা হয় সামরিক শাসন। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৩ সালে আওয়ামীলীগের কাউন্সিল সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৫৫ সালে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামীলীগের উদ্যোগে ১৭ জুন পল্টনের জনসভায় পূর্ব

পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়।

১৯৬২ সনে "হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের নামে গণ-বিরোধী শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আবার রাজপথ ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হয়। অবশেষে এলো ১৯৬৬ সাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালীর স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ঘোষিত ৬ দফা বাঙ্গালী আশা আকাঙ্খা মূর্ত প্রতীক পাকিস্তান শাসক গোষ্টির হৃদয়ে কাঁপন উঠলো। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ৬ দফার সমর্থনে হরতাল আহব্বান হলো। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দু'য়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হলো গণ-অভ্যুর্থানের জোয়ার। চারদিকে শ্লোগান উঠলো তুমিকে আমিকে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।

ছাত্র নেতা আসাদের রক্তে সিক্ত হলো রাজপথ, গর্জে উঠলো বাঙ্গালী জাতি। হয়ে উঠলো অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক শক্তি, স্বৈরাচার আউয়ুব খানের শাসন অবসান হলো। ক্ষমতা এলো নতুন সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান। বঙ্গ বন্ধুকে মুক্তি দেয়া হলো। ইয়াহিয়া খান এসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ গোটা পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ আওয়ামীলীগ ৬ দফার ভিত্তিতে '৭০-এর নির্বাচনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ৬ দফার ভিত্তিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যে আশ্বাস দিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা তো দূরের কথা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী সরকার গঠন করতেও গড়িমসি করেছিলো, আশ্রয় নিয়েছিলো কূটকৌশলের। ইয়াহিয়া খানের কঠোর সামরিক নির্বাচনী বিধানের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলো যে, নির্বাচনের সময় ৬ দফার প্রচার বন্ধ করে দেয়ার জন্যে সামরিক আদেশ জারি হবে কিন্তু তা না হলেও তার পরিণতি যে খুবই ভয়ঙ্কর ছিলো তা ১ মার্চের ঘটনাতেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে কোনো প্রকার আলোচনা না করে বেলা ১টার সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ ঘোষিত হলো স্বাধীনতার এস্তেহার। ৪মার্চ পতাকা, জাতীয় সংগীত, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং স্বাধীনতার লক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নির্বাচনের পর মুক্তি সংগ্রাম মূলত একটি একক নির্দেশনা পেলো।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে গোটা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী-লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহবান জানান। প্রায় দশ লক্ষের অধিক লোকের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন এবারের সংগ্রাম আমাদের "মুক্তির সংগ্রাম", এবারের সংগ্রাম "স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। অবশেষে সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙ্গালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হলো গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষন। বাঙ্গালী ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, পুলিশ, বি.ডি.আর, সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ সর্বস্তরের জনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পরও মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছে যা আমাদের জাতির জন্য কলঙ্কজনক। এসকল বিষয় কোনো দল বা ব্যাক্তিগত অর্জন নয় এটা সমগ্র জাতির গৌরবের বিষয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ-এর ভাষণ

২৫ মার্চ রাত্রে বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদেরকে সামরিক দিক নির্দেশনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সম্পর্কে, স্বাধীনতার ঘোষণা, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়া, মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনামূলক ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে সমালোচকরা বিভিন্নভাবে সমালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনকের কর্মকাণ্ডকে বর্তমান প্রজন্মের নিকট খাটো করার অপচেষ্টা যা সফল হয়নি। আজ সমালোচকরা যুদ্ধ অপরাধের বিচারের সম্মুখীন। প্রতি বিপ্লবীরা গণতন্ত্রের সুযোগে কালো টাকার মালিক হয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশের স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বার বার বাধাগ্রস্থ করে তুলছে। ১৯৭১ এর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ও ঘনিষ্ঠ সহচরদের লেখা বা তাদের কথাগুলো বিশ্লেষন করলে বুঝা যায়, আন্দোলন-সংগ্রামকে কিভাবে বঙ্গবন্ধু একত্রিত করে মূল লক্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়ার গতিবিধি, বাঙ্গালীর মনে নানান সন্দেহ ও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগলো। তার শম্বুক গতিতে বঙ্গবন্ধু অধৈর্য হয়ে উঠলেন। ইয়াহিয়া ইচ্ছে করেই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে জটিল ও বিলম্বিত করে তুলছেন। মুক্তিকামী জনতার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। লক্ষ লক্ষ জনতা রাজপথে নেমে এলো। একদিকে স্বাধীকার পাওয়ার আকাঙ্খা অন্য দিকে পাক-বাহিনীর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ার আশঙ্কা সব মিলিয়ে গগন বিদারী শ্লোগান বিক্ষোভে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হলো। ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামীলীগের জরুরি বৈঠক বসলো। মারমুখী জনতা ও সেখানে গিয়ে হাজির হলো। বঙ্গবন্ধু বৈঠক ছেড়ে বাইরে এলেন। ঘোষণা করলেন, "আজ যদি ইয়াহিয়া ঐ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুখ না খোলেন, তাহলে তাকে আলটিমেটাম দেয়া হবে। হয় অনতিবিলম্বে আপনারা ঘোষণা জানান, নয়তো বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান।" ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম, রংপুর, ঢাকার মিরপুর, যশোর ও অন্যান্য স্থানে পাক-বাহিনীর ইংগিতে ও সহযোগিতায় হত্যাযোগ্য ও লুটতরাজ শুরু হয়েছে। ঢাকার পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার ও অন্যান্য স্থানে ২৩ মার্চ যে জয় বাংলার পতাকা উড়ানো হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলার জন্য সামরিক বাহিনী তৎপর হয়ে উঠলো। এর জন্য যশোর ইপিআর হেড কোয়ার্টারে সামরিক বাহিনীর সাথে ইপিআর জোয়ানদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। বৈঠক শেষে রাতে বঙ্গবন্ধু পত্রিকায়

একটি প্রেস রিলিজ পাঠান। প্রেসরিলিজে তিনি বলেন, "এটা জেনে রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা ও বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না। আমার আস্থা আছে যে, বাংলাদেশের সাহসী সন্তানেরা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রস্তুত।"

ঐ রাতে বঙ্গবন্ধু কর্ণেল (অব:) ওসমানী, লে: কর্ণেল (অব:) এমএ রব, মেজর (অব:) শওকত আলী, ক্যাপ্টেন (অব:) নাজমুল হুদা, চীফ পেটি অফিসার (অব:) কামাল উদ্দিন আহমদ সহ কতিপয় অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে অনতিবিলম্বে দেশের সর্বত্র সামরিক বাহিনী, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর বাঙ্গালী অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। এবং তাদের মাধ্যমে তিনি কতিপয় সামরিক ডাইরেকশন প্রদান করেন। ২৫ মার্চ সকাল বেলা ইয়াহিয়া ও ভুট্টো বৈঠকে বসলেন। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামীলীগেরও বৈঠক বসলো। বঙ্গবন্ধুকে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন, তাদের পীড়া-পীড়িতে তিনি শুধু বললেন, "আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা ওদের গোয়ার্তমী পরিত্যাগ করেনি। আমরা আর আলোচনায় বসতে রাজি নই। বাংলার মানুষের কাছে পাকিস্তান এখন মৃত। ইয়াহিয়ার উপর নির্ভর করছে পাকিস্তানের আস্তিত্ব। অনেক রক্ত দিয়েছি, নীরব থেকেছি, কিন্তু আর নয় আঘাতের প্রত্যাঘাত দেয়া হবে।" দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এক বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে বলা হলো- পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রন ভার নিয়েছে। কোন বাঙ্গালীকে সেখানে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

এদিন ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আড়াই শতাধিক লোকের মৃত্যু সংবাদ বঙ্গবন্ধুর কানে এসে পৌঁছালো। পাক-বাহিনী এসকল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে ডক শ্রমিকেরা এমভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে অস্বীকৃতি জানালে পাক-বাহিনী ৪৫ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু এই হত্যাকাণ্ডের খবর শোনা মাত্র তীব্র নিন্দা করে ২৭ মার্চ দেশ ব্যাপী হরতালের আহবান জানান। তার বিবৃতি ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত হলো। ২৭ মার্চ হরতালের আহবান ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক কৌশল। বঙ্গবন্ধু জানতেন এই হরতালের কোনো মূল্য নেই। কারণ পাক-বাহিনী তার পূর্বে বাঙ্গালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, সে ধরনের গোপন সংবাদ বঙ্গবন্ধুর কানে এসেও পৌঁছলো। তিনি ও তার পরিকল্পনা অর্থাৎ পাক-

বাহিনীর আক্রমনের তাৎক্ষণিক জবাব দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। পাশাপাশি তিনি পাকিস্তান সরকারের সামনে নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিক হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন। হরতাল অসহযোগ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যাতে পাক-সরকার তাকে সামরিক প্রস্তুতির মধ্যে আছেন বলে ভাবতে না পারে। তাই নিজেকে সামরিক প্রস্তুতির মধ্যে রেখে বাহিরে পাক-বাহিনী চোখে ধুলো দেয়ার জন্য ২৭ তারিখে হরতাল আহবান করলেন। আর গোপনে গোপনে ইপিআর, পুলিশ, বাঙ্গলী সৈনিক ও ছাত্র যুবকদের পাক-বাহিনীর আক্রমন প্রতিহত করার নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। ২৫ মার্চ বিকেল ৩টায় বঙ্গবন্ধু পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল তসলিম উদ্দিন ও এসপি ইএ চৌধুরীকে নির্দেশ দিলেন, "কোন অবস্থাতেই অস্র হাত ছাড়া করানো যাবে না, অস্রাগার থেকে ছাত্র যুবকদের মধ্যে অস্র বিলিয়ে দাও।" পিলখানা ইপিআর-এর বাঙ্গালী অফিসারদের লোক পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন পাক-বাহিনীর আক্রমনের জবাব দিবে। যশোরের মশিউর রহমানকে ইপিআর, পুলিশ ও বাঙ্গালী সৈন্যদেরকে যথাযথ ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলতে নির্দেশ দিলেন। চট্টগ্রাম এমআর সিদ্দিকীর মাধ্যমে মেজর জিয়া ও মেজর রফিককে ও অন্যান্য স্থানে সকলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন। এ ব্যপারে কর্ণেল ওসমানীকে দায়িত্ব দিলেন। ঢাকার বলধা গার্ডেনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইপিআরের একটি ট্রান্সমিটার সেট প্রস্তুত রাখা হলো। মোটামুটি সব আয়োজন শেষ। পাক-বাহিনী আক্রমন করা মাত্রই বাংলাদেশের সকল স্থান থেকে এক যোগে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকার সেনানিবাস থেকে একজন তরুণ বাঙ্গালী সামরিক অফিসার রিকশা চালকের বেশে বঙ্গবন্ধুর বাসায় এলেন। তরুণ অফিসারটি বঙ্গবন্ধুকে আজ রাতে পাক-বাহিনীর সর্বাত্বক হামলার খবর সবিস্তারে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার সহকর্মীদের অনতিবিলম্বে আত্নগোপন ও সর্বাত্বক প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক করে দিলেন। আওয়ামীলীগ কর্মী বাহিনী ও ছাত্ররা তড়িৎগতিতে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়লো। প্রতিটি বড় বড় রাস্তার উপর মুহূর্তের মধ্যে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ফেলতে লাগলো। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যাতে পাক-বাহিনী ঢুকতে না পারে সেজন্য তার বাসার কাছাকাছি শুক্রাবাদে মীরপুর রোডের উপর বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ কর্মী রাশেদ মোশারফের নেতৃত্বে এলাকার লোকজন বিরাট বিরাট গাছ কেটে ও ইট, বালু ইত্যাদি দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ফেললো। এমনি করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামীলীগ কর্মী ও ছাত্ররা পাক-বাহিনীর চলাচলের উপর বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য শত শত ব্যারিকেড তৈরি করে ফেললো। সামরিক বাহিনীর হামলার কথা এ কান থেকে ও কান এভাবে

শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এ খবরে যারা বিশ্বাস করলো তারা নিরাপদ আশ্রয় নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আর অধিকাংশ লোক এ খবরকে গুজব হিসাবেই ধরে নিলো।

রাত ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামীলীগ শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামান, তাজউদ্দিন আহমেদ, কর্ণেল ওসমানী, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, ফনিভূষণ মজুমদার, ওবায়দুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, সাহজাহান সিরাজ সহ প্রমুখ সহকর্মীবৃন্দের আগমন ঘটতে লাগলো। নেতৃবৃন্দ বাসভাসনে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথাবার্তা বলছেন, কর্মীরা বাইরে দাঁড়িয়ে ও বসে উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করেছিলো। সকলের চোখে মুখে একটা গভীর আতঙ্কের ছায়া। বঙ্গবন্ধুর ড্রয়িংরুমের পশ্চিম পাশে প্যাসেজের উপর দাঁড়িয়ে এক একজন করে নেতৃবৃন্দকে ডেকে নিয়ে গোপনে কি সব কথাবার্তা বলে বিদায় দিচ্ছেন। সকলেই কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, কর্ণেল ওসমানী। এক সময় দেখা গেল বঙ্গবন্ধু বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক সাংবাদিক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের কাঁধে একখানি হাত রেখে অপর হাতে রুমালে চোখ মুচছেন। এক সময় দেখা গেল সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, তাজউদ্দিন আহমেদ, ফনি ভুষন মজুমদার, খন্দকার মোস্তাক আহমদ, আবদুস সামাদ আজাদ ও কর্ণেল ওসমানীকে কাছে টেনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু নিচুস্বরে কথা বলছেন এবং অনবরত চোখে রুমাল মুচছেন। একবার বঙ্গবন্ধুর কথা শোনা গেল, তিনি বললেন, "আমি এখানেই থাকবো। তোমরা আত্ম গোপন করো। পালিয়ে যাও এবং যা যা বললাম তাই করবে।" এর মধ্যে একবার বঙ্গবন্ধু বাইরে অপেক্ষামান কর্মীদের কাছে ছুটে এলেন। বললেন, "তোমরা এখান থেকে চলে যাও, সাবধানে থাকো এবং প্রতিরোধ গড়ে তোল, মরার আগে শয়তানদের মারতে হবে। আমি তোমাদের নেতাদের কাছে সবকিছু বলে দিয়েছি। হতাশ হয়ো না। তোমরা একা নও ভয়ের কিছু নেই। আমাদের জয় হবেই।"

একে একে নেতৃবৃন্দরা বিদায় নিচ্ছেন, রাত ৯টার উপরে। বঙ্গবন্ধু পূর্ব স্থানে ফিরে এসে কর্ণেল ওসমানীর একটা হাত বগলদাবা করে আরো একটু উত্তর দিকে এসে ছোট্ট বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। সিগারেট পাইপে অগ্নি সংযোগ করে ডান হাতে হাত কাটা কালো কোটের পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে সেটা কর্ণেল

ওসমানীর হাতে দিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "এটা আপনার কাছেই রাখুন, সময় মতো যা করবার তাই করবেন। আপনি সাবধানে থাকবেন। খবর পেয়েছি আমাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। বড় দায়িত্ব আমি আপনাকেই দিলাম। ভারত ও রাশিয়া সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনি আপনার অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে আমার বাংলার ছেলেদের পথ নির্দেশ দিবেন। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওয়ারলেসে ঘোষণাটি পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি এক্ষণি এখান থেকে চলে যান।" আত্মগোপন করেন কর্ণেল ওসমানী বঙ্গবন্ধুর এক খানা হাত ধরে বললেন "আপনি এখান থেকে চলেন। ওরা আপনাকে হত্যা করবে।" কর্ণেল ওসমানীকে বাধা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন "না না আমি পালাবোনা। ওরা আমার খোঁজে আমার সারা বাংলা চষে ফেলবে। আমার সব মানুষকে মেরে ফেলবে। আমি আমার নিরস্ত্র মানুষকে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে বাঁচতে চাই না। আমি আমার রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে চেষ্টা করবো। তাছাড়া আমি এখান থেকে পালিয়ে গেলে ইয়াহিয়া ও তার সঙ্গীরা নানান কুৎসা রটাবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। না, না আমাকে এখানে থাকতেই হবে। আমাকে হত্যা করলে জাতির মনোবল নষ্ট হবে না। বরং এর ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য আরো শক্তিশালী ভাবে গড়ে উঠবে। জাতির মনোবল অটুট থাকবে। আপনাকেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। আপনাকে যেন ওরা না পায়। প্লিজ, আপনি এক্ষুণি চলে যান। জীবনে বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। জয় বাংলা।"

কর্ণেল ওসমানী বঙ্গবন্ধুর হাতে চুমো খেয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন। সহসা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

ঐ দুর্যোগময় ২৫ মার্চ কাল রাত্রির এলেখার প্রত্যাক্ষদর্শীকে শেখ জামাল জোর করেই বিদায় দিলো। একমাত্র সঙ্গী ও ঘনিষ্ট সহচর হাজী গোলাম মোর্শেদ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপঃ
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকেও অন্য একটা ট্রাকে করে পাক-বাহিনী সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং তার উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন চালায়। জনাব হাজী মোর্শেদ বলেন, "রাত ১০টার দিকে আমি বাসা থেকে নিজের গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুর বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। শাহবাগ মোড়ে এসে দেখলাম এলিফ্যান্ট রোডে ব্যারিকেড পড়ে গেছে। আমি তখন এয়ারপোর্ট ধরে গ্রীণ রোডের দেখলাম তখন ধানমন্ডির ৯নং রোড দিয়ে ব্রিজ পার হয়ে পশ্চিম দিকের

ব্রিজটা পার হয় ৩২নং রোডে পড়ি। বঙ্গবন্ধুর বাসার গেইটের বাইরে পূর্ব দিকে গাড়ি পার্ক করলাম। বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলাম নিচতলা নিঝুম। বঙ্গবন্ধুর কক্ষে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি তিনি একা কক্ষে পায়চারী আর পাইপ টানছেন। আমাকে দেখে বললেন, দে আর কামিং টু কিল মি, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু ডাই, বাট হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম হেয়ার? ঠিক তক্ষুণি সেখানে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন সার্ভিস কমিশনের পরিচালক তবিবুর রহমান রুনু। রুনু বঙ্গবন্ধুর পায়ের উপর গড়িয়ে বললেন, "আপনি পালান" বঙ্গবন্ধু শান্তস্বরে বললেন, "ইফ দে ডন্ট গেট মি, দে উইল ম্যাসাকার অল মাই পিপলস্ এন্ড ডেস্ট্রয় দি অল সিটি টোটালী।" অতপর রুনু কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। রাত ১১টার দিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি চট্টগ্রাম মোস্তফা এ হোসেনকে জানালাম টেলিফোনে, মেজর জিয়াউরকে বলো, যেন সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে না পারে, জহুরুল আহমদ চৌধুরীকে ওয়ারলেস সেটের সামনে থাকতে বলো। রাত ১১.৩০ মিনিটের দিকে বেগম সিরাজুল হক, সুবোধ মিত্র ও অনেকেই টেলিফোন করলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে পালাতে অনুরোধ করলেন। আমিনুল হক বাদশা টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাকে পালিয়ে যেতে বললেন। আমি বললাম, "হি ইজ ডিসইডেড টু ডাই" তিনি পালাবেন না, ভাবী

২৫ মার্চ ১৯৭১ রাত ১-৩০ মিনিটে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

(বেগম মুজিব), রাসেল হাসিনা ও রেহানা এখানে আছেন। এরপর আমি নিচে সিঁড়ির পাশের কক্ষে চলে যাই। সেখানে টেলিফোন রিসিভ করতে থাকি, রাত ১টার পর মুহুমুহু গোলাগুলি আর বিচ্ছুরিত আলো আসতে লাগলো, বঙ্গবন্ধু আস্তে আস্তে হেঁটে এসে আমার ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, "তুই পালিয়ে যা।" তারপর কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, "গোলাগুলি কোন ডাইরেকশন থেকে আসছে রে।" আমি আন্দাজে মুখ ঘুরিয়ে বললাম "ওদিক থেকে আসছে।" এর কিছুক্ষন পর বলধা গার্ডেন থেকে টেলিফোন এলো, "ওয়ারলেস সেটটা কোথায়, রাখবো, এখানে আর যে টেকা যাচ্ছে না।" আমি বঙ্গবন্ধুকে জানালাম ওকে কী বলবো, বঙ্গবন্ধু বললেন, "কাজ হয়ে থাকলে পালিয়ে যেতে বলো।" রাত ১.২৫ মিনিটের সময় পাক-বাহিনী প্রচন্ড গোলাগুলি বর্ষন করতে করতে বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে প্রবেশ করে আমাকে প্রথম হ্যান্ডস-আপ করিয়ে বারান্দায় নিয়ে এসে রাইফেল দিয়ে পেটাতে থাকে। জ্ঞান হারাবার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর বজ্র কণ্ঠ আমার কানে ক্ষীণ হয়ে বাজলো, হাও ডেয়ার ইউ হিট হিম, আই ওয়ান্ট হিম এলাইভ।

বঙ্গবন্ধুর সাথে ২৪ এবং ২৫ মার্চ যে সকল কর্মী নেতৃবৃন্দরা এবং ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন তাদের উপরক্ত বক্তব্য একটি ইতিহাস যা নতুন প্রজন্মের একটা গবেষণার বিষয়। আবির আহাদ বিরচিত "বঙ্গবন্ধুঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ" বই এ উল্লেখিত লেখার বিস্তারিত বর্নণা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো বিস্তারিত লেখা রয়েছে।

চাক্ষুষদর্শি বিদেশি সাংবাদিকদের চোখে ২৫ মার্চ রাত্রের গণহত্যা

২৫শে মার্চ রাত্রের গণহত্যা

বিশ্বজুড়ে পাক-বাহিনীর গণহত্যার কথা প্রকাশ পেতে থাকে। সমগ্র বিশ্ববাসী ও তার নেতৃবৃন্দ একটা দেশের নিরস্ত্র জন-সাধারনের উপর সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বের সকল সংবাদ পত্র বেতার ও টেলিভিশন এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে সেই ভয়াবহ ঘটনার দুজন চাক্ষুষদর্শি বিদেশি সাংবাদিকের বিবরণীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের সেই দিনগুলো জাতি কিভাবে রূদ্ধশ্বাসে অতিক্রম করেছে। "রক্তই যদি কোন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের বিনিময় মূল্য বলে বিবেচিত হয়, তবে বাংলাদেশের জনগণ অনেক বেশী দাম দিয়েছে।"

৭১ এর ১৬ এপ্রিল সংখ্যায় লন্ডনের টাইমস পত্রিকা বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন, ৭১ এর ২৬ ও ২৭ মার্চ যখন পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ঢাকা থেকে বিদেশি সাংবাদিকদের বহিস্কার করেন। তখন পাক বাহিনীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেখার জন্য লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ঢাকায় আত্নগোপন করেন। পাক সরকারের বহিস্কারাদেশ উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে সংগোপনে ঘুরা ফেরা করেন পাক-বাহিনীর হামালার পর ৭২ ঘণ্টার তাণ্ডবলীলা বিভিন্ন স্থান থেকে মনিটর করেন। অপর দিকে সিডনি এইচ শেনবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা, তিনিও পাকিস্তান সরকারের প্রচারিত স্বাভাবিক অবস্থায় অসারতা প্রমাণ করে তার প্রতিবেদন লেখেন। ইউরোপ-আমেরিকার বহুল প্রচারিত পত্রিকা সমূহে ২৫ মার্চের কালো রাতে রাজধানী ঢাকায় কী ঘটেছে তার সচিত্র প্রতিবেদন ছাপেন। তাদের এ নির্ভীক সাংবাদিকতার ফসল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে রেখেছেন বিশেষ ভূমিকা। সাইমন ও শেনবার্গের প্রতিবেদন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। অনেক দেরিতে হলেও জাতি ২০১০ সালে এই দুজন সাংবাদিককে মুক্তিযুদ্ধা হিসাবে

স্বীকৃতি প্রদান করে সম্মানিত করেছে। "৭১ সালের ৩০ মার্চ এবং ১৪ জুলাই সংখ্যায়" দৈনিক টেলিগ্রাফ এবং নিউ ইউয়র্ক টাইমস-এ প্রদর্শিত নিবন্ধের অনুবাদ: ৩০ মার্চ "ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় ঢাকা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্যে খেসারত দিয়েছে" শিরোনামে সাইমুন ড্রিং এর প্রতিবেদন বের হয়। সাইমন তার প্রতিবেদনে লেখেন- পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে দেখা গেলো। নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, এদের অনেকেই নিহত হয়েছেন। মুজিবের সমর্থক দু'টো সংবাদপত্র অফিস ধ্বংস করা হয়েছে। ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার রাস্তায় চলমান ট্যাংকগুলোর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্ররা। ঢাকার উপর আক্রমণ চালাবার জন্য সাজোয়া, গোলান্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর কমপক্ষে তিন ব্যাটালিয়ন ব্যবহার করা হয়। সৈন্যরা রাত দশটার কিছু আগে ছাউনি ত্যাগ করতে শুরু করে। রাত ১১টায় গুলি বর্ষণ শুরু হয় এবং যারা উল্টানো গাড়ি, গাছের গুড়ি, আসবাব এবং কংক্রিটের পাইপ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করার চেষ্টা করেছিল তারা নিহত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোনে বলা হলো, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তার ধানমন্ডির ৩২নং বাসা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। শেখ মুজিব তার এক সহকর্মীকে বলছিলেন "আমি যদি পালাই তবে ওরা আমাকে খুঁজে বের করতে পুরো ঢাকা জ্বালিয়ে দেবে।" যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহকৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এম-২৪ ট্যাংকের পিছু পিছু একদল সৈন্য মধ্য রাতের কিছু পর ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হয়। সেনাদল বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দখল করে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শেল নিক্ষেপের জন্য বৃটিশ কাউন্সিলকে তারা "ফায়ারবেস" হিসেবে ব্যবহৃত করে।

আমাকে বলা হয় সরকারবিরোধী চরমপন্থি ছাত্রদের কেন্দ্রস্থল ইকবাল হলে হঠাৎ হানা দিয়ে ২০০ ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। দু'দিন পর দেখতে পেলাম পোড়া ঘরগুলোর ভেতর পড়ে আছে কিছু মৃতদেহ, কিছু বাহিরে ছড়িয়ে আছে। কিছু আবার ভাসছিল কাছের পুকুরে। এক শিল্পী ছাত্রকে দেখা গেল ইজেলের কাছে পড়ে আছে লুটিয়ে। মাত্র ৩০টি মৃতদেহ ইকবাল হলে দেখা যায়। কিন্তু হলের করিডোরে যত রক্ত দেখা গেল তাতে অনুভূতি হয় মৃত্যুর সংখ্যায় অগণিত। অপর একটি হলে পাক সৈন্যরা তাড়াহুড়ো করে গণকবর খুঁড়ে মৃতদের কবর দিয়ে ট্যাংক দিয়ে সমান করে দেয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাস করতেন তারাও এই আক্রমণের শিকার হন। রেল লাইনের পাশে দুশ গজ জুড়ে যে বস্তি এলাকা ছিল তা ধ্বংস করে দেয়া হয়।

একদল সৈন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালাচ্ছিল তখন অপর একটি দল পুলিশের কেন্দ্র রাজারবাগের দিকে রওনা হয়। প্রথম ট্যাংক থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়। এরপর সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে এদের আস্তানাগুলো সমান করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বিল্ডিং গুলোতে এলো পাতাড়ি গুলি চালায়। পুলিশ কেন্দ্রে অবস্থানরত ১১শ পুলিশের মধ্যে তেমন কেউ পালাতে পারেনি।

একদিকে চলছে এমন সব ঘটনা আর অন্যদিকে তখন আর এক ঘটনা চলছে। আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবের বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে। রাত ১টার সামান্য আগে শেখ মুজিবের সাথে টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করা হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, যেকোনো মহূর্তে তিনি আক্রমণের আশঙ্কা করছেন এবং শুধু দেহরক্ষী ও চাকর ছাড়া সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রাত্র ১টা ১০ মিনিটে একটি ট্যাংক একটি সাজোয়া গাড়ি এবং সৈন্যভর্তি ট্রাক গুলি করতে করতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসে। বাইরে থেকে একজন অফিসার চিৎকার করে বলে উঠল "শেখ নিচে নেমে আসুন।" শেখ মুজিব তার বাসার বেলকুনিতে বের হয়ে এসে বললেন, "আমি তৈরি গুলি করার প্রয়োজন নেই। তোমরা আমাকে টেলিফোন করলে আমি চলে আসতাম।" অফিসারটি তখন প্রাঙ্গনের ভিতর ঢুকে মুজিবকে বলল, "আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।" তিনজন চাকর, একজন পার্শ্বচর ও একজন দেহরক্ষীশুদ্ধ শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়া হলো। মুজিবের দেহরক্ষী অফিসারটিকে বেদম পেটানো হলো। পাশের বাড়ির প্রাচীরের আড়ালে লুকানো একজন নৈশ প্রহরীকে হত্যা করা হলো। শেখ মুজিবকে যখন সেনা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পাক সৈন্যরা ৩২নং বাড়ির ভিতর ঢুকে সমস্ত নথি পত্র নিলো, সামনে যা কিছু পেল ভাঙ্গলো আর সবুজ লাল হলুদ বাংলাদেশ পতাকা ভুপাতিত করে চলে গেল।

পাক-সৈন্যরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের জায়গা দখল করে নিয়েছিল তখন শহরের চারদিকে আগুন জ্বলছিল। ইন্টার কান্টিনেন্টাল হোটেলের উল্টো দিকে বর্তমান (শেরাটন হোটেল বা রূপসি বাংলা)। "দি পিপল" পত্রিকার অফিস ও নৈশ পাহারাদারসহ আশপাশের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলো। ভোরের কিছু আগে গুলি বর্ষণ থেমে গেলে সূর্য ওঠার পর শহরে এক ভয়ংকর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। দু'একটি ট্যাংকের শব্দ, কনভয়ের শব্দ ও কাকের চিৎকার ছাড়া সমস্ত শহরটি হয়েছিল প্রেতপুরী। দুপুরের দিকে সৈন্যরা আবার পুরনো শহরের দিকে

ঢুকতে লাগলো এবং পরবর্তী এগারো ঘণ্টা পুরনো শহর নামে পরিচিত অঞ্চলের বিরাট অংশ তারা ধ্বংস করল। যেখানে শেখ মুজিবরের সমর্থক সংখ্যা বেশি। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চরোড, নাজিরা বাজার, নয়াবাজার পুড়িয়ে মাটির সাথে মিলিয়ে দিল, সেনা বাহিনী স্ট্র্যাটেজি এই রকম গ্যাসোলিনের টিন হাতে সৈন্যরা অগ্রবর্তী ইউনিটকে অনুসরণ করত। যারা পালাবার চেষ্টা করত তাদের গুলি করে হত্যা করা হতো। যারা থাকতো তারা স্বাভাবিক ভাবে পুড়ে মারা যেত। আধাবর্গ মাইলের চেয়ে বেশি এমনি তিনটি এলাকায় এরকম প্যাটার্ন অনুসরণ করা হতো।

জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল, "আমি আমার কনস্টেবলদের খুঁজছি।" শনিবার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ইন্সপেক্টর আরও বলল, "আমার এলাকায় ছিল ২৪০ জন এবং এপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি মাত্র ৩০ জনকে এরা সবাই মৃত।" পুরনো শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সৈন্যরা লোকদের জোর করে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করছে এবং এলাকাকে শেষ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। ২৬ মার্চ রাত ১১টা পর্যন্ত পুরনো শহরে সৈন্যরা স্থানীয় বাঙ্গালী ইনফরমারদের নিয়ে ঘুরছিলো। নিয়ম ছিল সৈন্যরা অগ্নি গোলক জ্বালিয়ে দিত আর চরেরা আওয়ামীলীগ সমর্থকদের ঘরবাড়ি দেখিয়ে দিত। ইতমধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা শহর থেকে দশ মাইল দূরে শিল্প এলাকার দিকে চলে যাচ্ছিল। বাংলা সংবাদপত্র "ইত্তেফাক" অফিসও ছিল অভিযানের একটি প্রধান লক্ষ। অভিযান শুরু হওয়ার পর পরই ঐ অফিসে প্রায় চারশ লোক আশ্রয় নিয়েছিল। শুক্রবার বিকেল চারটায় বাইরের রাস্তায় দেখা গেল চারটি ট্যাংক। বেলা সাড়ে ৪টার দিকে অফিসটি ভস্মীভূত করা হলো। শনিবার সকালে দেখা গেল অফিসের পিছনের কামরায় পড়ে আছে কতগুলো পোড়া লাশ।

শনিবার সকালে রেডিওতে ঘোষণা দেয়া হয় সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করা হবে। আরও রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, প্রেস সেন্সরশীপ জারি করা হলো, এবং সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে আদেশ করা হলো। বেলা দশটায় দেখা গেল রাস্তাগুলো লোকজন ভরে গেছে। সবাই শহর ত্যাগ করছে। অন্য দিকে তখনো পুরনো শহরের অনেক এলাকার উপর কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। গাড়ি রিকশা নয়, বেশিরভাগ লোক পায়ে হেঁটে জিনিসপত্র নিয়ে পালাচ্ছিল। সরকারি অফিসগুলো প্রায় শূন্য পড়ে রইল। প্রায় প্রত্যেকটি গাড়ি হয় লোকজন নিয়ে গ্রামের দিকে পালাচ্ছিল। নয় রেডক্রসের পতাকা উড়িয়ে মৃত ও আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। শনিবার বিকাল চারটা নাগাদ রাস্তা ঘাট আবার খালি হয়ে গেল। রেডিওতে

ঘোষণা করা হয়েছিল, "চারটার পর যে বের হবে তাকে গুলি করা হবে।" ঢাকা বার ক্লাবের নৈশ পাহারাদারকে গুলি করা হলো যখন সে ক্লাবের গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল। এদিকে বাস্তুত্যাগীরা আবার শহরের দিকে ফিরে আসছিল। কারণ শহর থেকে বের হওয়ার বেশ কিছু পথ খান সেনারা আটকে দিয়েছিল। সৈন্যদের এড়িয়ে গ্রামে যাওয়ার পথে তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছিল। বহুলোক রাস্তা ছেড়ে নদী পথে রওনা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের সামনে ছিল অন্য বিপদের ঝুঁকি। দেখা গেল কার্ফু'র সময় হলে কেউ কেউ নৌকা না পেয়ে আটকে যেত। শনিবার বিকেলে এমনি এক বিরাট দল আটকে গিয়েছিল। পরদিন সকালে সেখানে খুঁজে পাওয়া গেছে রক্তের দাগ। "পশ্চিম পাকিস্তানিরা এখন বাঙ্গালীদের পদানত করে রাখতে চায়।"

নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা সিডনি এইচ, শোনবার্গ উক্ত শিরোনাম ১৯৭১ সালের ১৪ জুলাই পত্রিকায় লেখেন- এখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা প্রায় জনশুন্য, রাস্তায় কেবল চলাচল করছে সেনা বাহিনীর ট্রাক। ঐসব ট্রাকে রয়েছে বন্দীরা। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কঠিন শ্রমশিবিরে। তাদের মাথা কামানো পায়ে কোন জুতো নেই। আর পরনে কেবল জাঙ্গিয়া।

বাঙ্গালী সংস্কৃতি নামাংকৃত রাস্তা ঘাটগুলোর নাম পাল্টে দেয়া হচ্ছে। শাঁখারী বাজারের নাম দেয়া হচ্ছে টিক্কা খান রোড, যাকে বাঙ্গালীরা নাম দিয়েছে কসাই, পাকিস্তানি শাসক বাহিনীর এই অঞ্চল তাদের দখলে রাখতে এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পদানত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। দায়িত্বশীল কাজের জন্য কোনো বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না এমনকি ঢাকা বিমান বন্দরে যে ব্যাক্তিটি ঘাস কাটে সেও অবাঙ্গালী। বাঙ্গালী ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রায় নেই বললেই চলে। এই কাজে চাকুরি দেওয়া হয়েছে ভারত থেকে আগত মুজাহিদ বা বিহারীদের। এ সমস্ত বিহারীরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে একাত্ম বলে মনে করে। তারা সরকারের পক্ষাবলম্বন করে এবং খোঁজ খবর দিয়ে সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কাজ চালাচ্ছে। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী নতুন এক প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে। যাকে সহজ ভাষায় বলা যায় অনুগত নাগরিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার শান্তি কমিটির সদস্য, বিহারী এবং অন্যান্য উর্দূভাষী মুসলমান ছাড়াও এদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম ডানপন্থী ধর্মীয় দল মুসলিমলীগ ও জামায়াত ইসলামী সমর্থক। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম বর্তমানে নবশক্তি সঞ্চয় করেছে ভারতীয় সীমানার আশ্রয়স্থল থেকে। নতুনলোক এবং সরবরাহ নিয়ে ভিয়েতনামী কায়দায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে বাঙ্গালীরা। যা

সামরিক বাহিনী মনে করছে ত্রাসের সঞ্চার। একজন মিশনারী জানালেন, বরিশাল জেলায় সম্প্রতি সেনা বাহিনী একদিনে এক হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছে। অপর এক বিবরণীতে প্রকাশ সিলেট জেলার একটি শান্তি কমিটি কোনো এক অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের মনে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার নামে এক সভা থেকে "তিনশ" হিন্দুকে তুলে নিয়ে হত্যা করে। অলৌকিকভাবে মুক্তি পাওয়া এক ব্যবসায়ী জানালেন, সে জেলে সারা রাত প্রার্থনা এবং পূর্ববর্তী বন্দিদের লেখা পড়ে কাটায়। তিনি জানান লেখা গুলো প্রায় এক রকমের। নিজের নাম, বন্দীর ঠিকানা এবং গ্রেফতারের তারিখ ছাড়া লেখা আছে। "আমি হয়ত নাও বাঁচতে পারি, দয়া করে আমার পরিবার পরিজনকে বলবেন। আমার ভাগ্যে কী ঘটেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়, এ ঘনঘটা মহুর্তে তাজউদ্দিন আহমদসহ কয়েকজন নেতা ৩রা এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক কালেই তাজউদ্দিন আহমদ মনস্থির করলেন, সংগ্রাম সফল করতে হলে আইনানুগ সরকার গঠনের বিকল্প নেই, সরকার গঠিত না হলে বহিঃবিশ্বের সহয়তা পাওয়া যাবে না। কিভাবে সরকার গঠিত হবে, কারা সেই সরকার থাকবেন, সেই প্রশ্নের জবাবও অজানা ছিল না। এই বিচক্ষণ রাজনীতিকের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও চার সহ-সভাপতিকে নিয়ে হাই কমান্ড গঠন করেছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ ঠিক করলেন, তারাই হবেন সরকারের প্রধান কান্ডারি। দিল্লি থেকে ফিরে তিনি দলের অন্যান্য নেতার খোঁজে বের হন। অনেকেই তখন কলকাতায় পৌঁছে গেছেন।
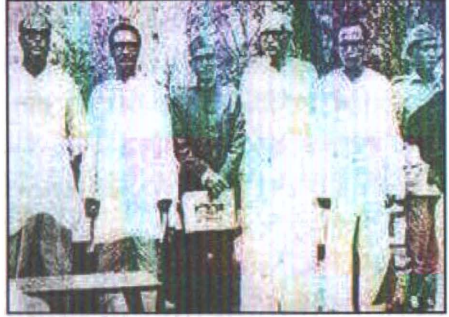
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশ সরকার প্রথম সরকার গঠন করা হয়ঃ

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (রাষ্ট্রপতি)
(২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)
(৩) তাজউদ্দীন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও সংস্থাপন)
(৪) ক্যাপ্টেন মুনসর আলী (অর্থমন্ত্রী)
(৫) খন্দকার মুস্তাক আহমদ (পররাষ্ট্রমন্ত্রী)
(৬) এইচ এস কামরুজ্জামান (স্বরাষ্টমন্ত্রী)
(৭) কর্নেল এম এ জি ওসমানি (প্রধান সেনাপতি)

মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর বৈধ্যনাথ পাড়ায় আমবাগানে প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

হয়। এই মন্ত্রিসভা গঠনে তাজউদ্দিন আহমদ সবচেয়ে বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আওয়ামীলীগের যুব নেতৃত্বের কাছ থেকে। তাদের দাবি ছিল বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তা গ্রহনযোগ্য হতো না। বিশেষ করে, গণতান্ত্রিক দেশগুলো এধরনের কাঠামোকে সন্দেহের চোখে দেখত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকচক্রের অস্বীকৃতি। সেক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠনই ছিল উত্তম পথ। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল না হলেও তার অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিরবে সমর্থন করেছেন তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আসলে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব এককভাবে নিজেদের হাতে নিতে চেয়েছিলেন যুব নেতারা। আওয়ামীলীগের বাইরের কাউকে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতেও প্রবল আপত্তি ছিল তাদের। কিন্তু তাজউদ্দিন আহমদ তাদের কথা আমলে না নিয়ে দল ও মতের লোকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো। যা ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়।

পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র আছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১০ এপ্রিল ছয় সদস্যের সরকার গঠনের পাশাপাশি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও জারি হয়। পরদিন ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন যা আকাশ বানি বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিক বার প্রচারিত হয়। তখন বাঙ্গালী জাতির প্রিয় ছিল আকাশ বাণী বেতার কেন্দ্র। দেশ ও বিদেশের মানুষ জানল বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষে একটি আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে। এই ভাষণে তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, "পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য বাঙ্গালী সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অজেয় মনবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙ্গালী সন্তান রক্ত দিয়ে এই শিশু রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এই নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না।"

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো। কিভাবে কাজ করছে এই সরকারের বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকার অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব নেই, কেবল ভারতের প্রচারণা। সেজন্য দেখাতে

হবে, বাংলাদেশের মাটিতেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে। শপথ গ্রহণের স্থান নির্ধারণ করা হলো পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননকে। এলাকাটির তিন দিকে ভারত। তাই পাকিস্তানি বিমান হামলার আশঙ্কা ছিল না ১৬ এপ্রিল কলকাতা প্রেসক্লাবে এসে বাংলাদেশ সরকারের দুই প্রতিনিধি আবদুল মান্নান ও আমীরউল ইসলাম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সাংবাদিকদেরকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের বলা হলো, পরদিন সকাল আটটায় প্রেসক্লাব থেকে গাড়ি রওনা হবে। কাউকে জানানো হলো না কোথায় যেতে হবে।

নির্ধারিত সময়ে সাংবাধিকদের গাড়ি বহর এসে বৈদ্যনাথ আমতলায় এসে পৌঁছালো। এর আগেই এসেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সরকারি কর্মকর্তারা। এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (অব:) আতাউল গনি ওসমানী। ইপিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা এলেন। আশপাশের এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষ। প্রথমে কোরআন তেলওয়াত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। বাংলাদেশের মানচিত্র শোভিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। স্থানীয় চার তরুণ গাইলেন জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি... ।" জাতীয় পরিষদের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী মুহুর্মুহু শ্লোগান ও করতালির মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ এবং শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন।

শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে নবগঠিত রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন এবং প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আট পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি পাঠ করেন। তারা বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে বিশ্ববাসীর সহয়তার আহব্বান জানালেন। এরপর তাজউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সাংবাদিকরা জানতে চান বাংলাদেশের রাজধানী কোথায়? জবাবে তিনি বলেন, "মুজিব-নগর"। মুজিবনগর ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। যুদ্ধকালীন সরকার নয় মাস এই মুজিবনগরেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। নিয়েছে দেশ গঠন ও উন্নয়নের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

স্বাধীনতা ঘোষণা-পত্র মুজিবনগর বাংলাদেশ ১০ এপ্রিল ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামীলীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন। এবং
যেহেতু সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহব্বান করেন। এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনি ভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়। এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তের বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাস- ঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে। এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাস ঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে

সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে। এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রনয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভুখন্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পারিক আলোচনা করিয়া, এবং বাংলাদেশের জনগনের জন্য সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করনার্থ সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম। এবং তৎদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম। এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধানপ্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা সহসকল নির্বাহী ও আইন প্রনয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, একজন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, গণপরিষদ আহব্বান ও মূলতবিকরন ক্ষমতার অধিকারী

হইবেন, কর আরোপন ও অর্থায়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, গণপরিষদ আহ্বান ও মূলতবিকরন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। এবং

বাংলাদেশের জনগনকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য্য করিতে পারিবেন। আমরা বাংলাদেশের জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষে এবং রাষ্ট্র ও উপরাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতা বলে ও তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি এই ঘোষণাপত্র ১০এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মুজিব নগরে ঘোষিত ও জারিকৃত এবং ২৩ মে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী পরিষদ নির্বাচনের পর সরকারের সচিবালয়ের সচিবদের নাম ঃ-
মূখ্য সচিব : রুহুল কুদ্দুস।
সংস্থাপন সচিব : নুরুল কাদের খান
মন্ত্রি পরিষদ সচিব এইচ টি ইমাম।
তথ্য সচিব : আবদুস সামাদ। আনোয়ারুল হক খান (১৪ অক্টোবর থেকে)
অর্থ সচিব : খন্দকার আসাদুজ্জামান।
পররাষ্ট্র সচিব : মাহবুবুল আলম চাষী।
স্বররাষ্ট্র সচিব : এম এ খালেক

কৃষি সচিব : নুরউদ্দিন আহমদ

প্রতিরক্ষা সচিব : আবদুস সামাদ

আইন সচিব : এ হান্নান চৌধুরী

শিক্ষা উপদেষ্টা : কামরুজ্জামান

তথ্য, বেতার, ফিল্ম, আর্ট ও ডিজাইন বিভাগের দ্বায়িত্বপ্রাপ্তঃ আবদুল মান্নান এমএনএ। পরিকল্পনা কমিশন চেয়ারম্যানঃ ড. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, ড. স্বদেশ বসু, ড. মুশাররফ হোসেন, ড. সারওয়ার মুরশিদ, ড. আনিসুজ্জামান।

মন্ত্রিপরিষদ ও তার সচিবালয় গঠনের পর প্রথম সরকারি নির্দেশ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদের এই নির্দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এতে দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহব্বান ছিলঃ

১. কোন বাঙ্গালী কর্মচারী শক্রপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। ছোট-বড় প্রতিটি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন। শক্র কবলিত এলাকায় তারা জন প্রতিনিধিদের এবং অবস্থা বিশেষে নিজেদের বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবেন।

২. সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের যে সমস্ত কর্মচারী অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তারা স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করবেন।

৩. সকল সামরিক আধাসামরিক লোক কর্মরত বা অবসর প্রাপ্ত অবিলম্বে নিটতম মুক্তি সেনা যোগ দেবেন। কোনো অবস্থাতেই শক্রর হাতে পড়বেন না বা শক্রর সাথে সহযোগিতা করবেন না।

৪. যে কেউ শক্র পক্ষকে খাজনা ট্যাক্স দেবে অথবা এ ব্যাপারে সাহায্য করবে, বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তি বাহিনী তাদেরকে জাতীয় দুশমন বলে চিহ্নিত করবে এবং দেশদ্রোহের দায়ে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নৌ চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোনো অবস্থাতেই শক্রর সাথে সহযোগিতা করবেন না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তার যানবাহনাদি নিয়ে শক্র কবলিত এলাকার বাইরে চলে যাবেন।

৬. কালো বাজারী, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে হবে। এদের প্রতি কঠোর নজর রাখতে হবে।

৭. গ্রামে গ্রামে রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মুক্তি বাহিনীর নিকটতম শিক্ষা শিবিরে রক্ষী বাহিনীর স্বেচ্ছা সেবকদের পাঠাতে হবে।

৮. শক্র পক্ষের গতিবিধির সমস্ত খবরা খবর অবিলম্বে মুক্তি বাহিনীর কেন্দ্রে জানাতে হবে।

৯. স্বাধীন মুক্তি বাহিনীর যাতায়াত ও যুদ্ধের জন্য চাওয়া মাত্র সমস্ত যানবাহন (সরকারি/বেসরকারি) মুক্তি বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে।
১০. বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী অথবা বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারো কাছে পেট্রোল, ডিজেল, মবিল ইত্যাদি বিক্রি করা চলবে না।
১১. কোনো ব্যক্তি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অথবা তাদের এজেন্টদের কোনো প্রকারের সুযোগ-সুবিদার সংবাদ সরবরাহ অথবা পথ নির্দেশ করবেন না। যে করবে তাকে আমাদের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
১২. শত্রু বাহিনীর ধরা পড়া সমস্ত সৈন্যকে মুক্তি বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হবে।

উপরোক্ত সরকারি নির্দেশ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতো এবং ১১ মে ৭১ সালে সাপ্তাহিক "জয় বাংলা" পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষনে বঙ্গবন্ধুর বলেছিলেন, "আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।" এই কথার দ্বারা আওয়ামীলীগের কোনো প্রকার নেতৃত্ব সংকট হয়নি। যার দ্বারা ১৭ই এপ্রিলের নির্বাচিত পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচারিত পূর্ববর্তী তারিখ যুক্ত (১০ এপ্রিলের) "স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণায়" শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ গণতন্ত্রের কার্যানির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রনয়নের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা এমনকি প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী সভার সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতে অস্তায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয় এবং স্বাধীনতা আদেশটি ২৬ মার্চ থেকে কার্যকারিতা লাভ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে এবং বিশেষ করে পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে মন্ত্রিসভা গঠন ছিল বিরাট রাজনৈতিক অগ্রগতি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সেক্টর ভিত্তিক ইতিহাস

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই বাংলাদেশ বাহিনী গঠিত হয়। কর্ণেল এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ দিয়ে বাংলাদেশকে কয়েকটি সামরিক অঞ্চল বা সেক্টরে ভাগ করা হয়। যুদ্ধকে গতিশীল করা এবং চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য ১১ থেকে ১৫ই জুলাই সেক্টর কমান্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনী নিয়ে ১-১১নং সেক্টরে ভাগ করা হয়। যার নাম জেড ফোর্স, এস ফোর্স, কে ফোর্স।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকার তথ্য অনুযায়ী

কমান্ডারদের নাম ভিত্তিক

দেশরক্ষা মন্ত্রী   তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রধান সেনাপতি   কর্নেল এম এ জি ওসমানী।

চিফ অব স্টাফ   লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব।

ডিপুটি চিফ অব স্টাফ : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

জেড ফোর্স কমান্ডার   মেজর জিয়াউর রহমান।

এস ফোর্স কমান্ডার : মেজর কে এম শফি উল্লাহ্।

কে ফোর্স কমান্ডার : মেজর খালেদ মোশাররফ।

সেক্টর নং	কমান্ডারদের নাম	সাল	নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা	গণ বাহিনীর সংখ্যা
১	মেজর জিয়াউর রহমান মেজর রফিকুল ইসলাম	এপ্রিল-১০ জুন ৭১ ১১ জুন-১৬ ডিসেম্বর ৭১	২,১০০ জন	২০,০০০ জন
২	মেজর খালেদ মোশাররফ ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার আকবর	এপ্রিল-অক্টোবর ৭১ অক্টবর ১৬ ডিসেম্বর ৭১	৪,০০০ জন	৩০,০০০ জন
৩	মেজর কেএম শফিউল্লাহ্ মেজর এএনএম নরুজ্জামান	৩০ এপ্রিল-অক্টোবর ৭১ ১অক্টবর-১৬ ডিসেম্বর ৭১	৬,৬৯৩ জন	২৫,০০০ জন
৪	মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত	মে-১৬ ডিসেম্বর ৭১	৯৭৫ জন	৯,০০০ জন
৫	মেজর মীর শওকত আলী	আগস্ট-১৬ ডিসেম্বর ৭১	১,৯৩৬ জন	৯,০০০ জন
৬	উইং কমান্ডার এমকে বাশার	জুন-১৬ ডিসেম্বর ৭১	২,৩১০ জন	১১,০০০ জন
৭	মেজর খন্দকার নাজমুল হক মেজর কাজী নুরুজ্জামান	এপ্রিল-আগস্ট ৭১ আগস্ট-১৬ ডিসেম্বর ৭১	২,৩১০ জন ৩,৩১১ জন	১২,৫০০ জন ৮,০০০ জন
৮	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী মেজর এম আবুল মঞ্জুর	এপ্রিল-আগস্ট ৭১ ১৮আগস্ট-১৬ডিসেম্বর ৭১	৩,৩১১ জন	৮,০০০ জন
৯	মেজর এমএ জলিল	এপ্রিল-১৬ডিসেম্বর ৭১	৩,৩১১ জন	৮,০০০ জন
১০	নৌ কমান্ডারদের নিয়ে এই সেক্টরটি গঠিত, নৌ-কমান্ডার ৫১৫ জন। কোন সেক্টর কমান্ডার নিজুক্ত করা হয়নি প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রনে ছিল এই বাহিনী।			
১১	মেজর জিয়াউর রহমান মেজর আবু তাহের ফ্লাইট লেফন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ্ খান	১০ জুন-১২ আগষ্ট ৭১ ১২ আগষ্ট-১৪ নভেম্বর ৭১ ১৫ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর ৭১	২,৩১০ জন	২৫,০০০ জন

জেড ফোর্সে ১ম, ৩য় ও ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
এস ফোর্সে ২য় ও ১১তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
কে ফোর্সে ৪র্থ ৯ম ও ১০ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

বাংলাদেশ বাহিনী গঠন করার পর সেক্টর কমান্ডারদেরকে নিয়ে জুন মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রশাসনিক ও রনকৌশলের সুবিধার্থে রনাঙ্গানকে কয়েকটি অঞ্চলে বা সেক্টরে ভাগ করা হবে। মন্ত্রিসভা প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী ১১ থেকে ১৫ জুলাই সেক্টর কমান্ডারদের সভা আহব্বান করেন। সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে। সভায় সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও সদর দপ্তরের স্টাফ অফিসাররা এবং সেক্টরের বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টারাও যোগ দেন। যুদ্ধ-কালে এটিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের একমাত্র সামরিক সভা, পরবর্তী সময়ে সেক্টর কমান্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায়।

সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত :

অনেকগুলো কোম্পানি নিয়ে একটি সেক্টর গঠিত হবে। সেক্টরের এলাকা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে সেক্টরের কোম্পানি সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। সেক্টরের দায়িত্ব ও অপরেশন পদ্ধতি সমূহ সভায় নির্ধারণ করা হয়।

● সেক্টর সমূহের সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং ১৮ জুলাই অতি গোপনীয়পত্রের মারফত তা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হয়। নির্দেশ দেয়া হয়, এক সেক্টর অপর সেক্টরের এলাকায় অপারেশন করবে না।

● সৈনিকদের মধ্যে যে সমস্ত সৈনিক বিমান, নৌ, গোলন্দাজ, সিগন্যাল বিষয়ে পারদর্শী তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে। যাতে এদের দ্বারা ঐ সমস্ত বাহিনী গঠন করা যায়।

● ইয়ুথ ক্যাম্পের সঙ্গে বাংলাদেশ বাহিনীর কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না। ইয়ুথ ক্যাম্প সরকারের ভিন্ন সংস্থা পরিচালনা করবে।

● গণ-বাহিনীর গঠন, কর্মপন্থা, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২৫ জুলাই গণ-বাহিনীর সংগঠন, অস্ত্রসস্ত্র, পোশাক রণকৌশল, আত্মীকরণ সম্বন্ধীয়পত্র জারি হয়। এই পত্রে প্রেরিত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাবলীর অতিরিক্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত ২৭ ও ৩১শে জুলাই সকল সেক্টরে প্রেরণ করা হয়।

সদর দপ্তর ও সেক্টরের মধ্যে বেতার যোগাযোগ ভারতীয় সেক্টরের মাধ্যমে রক্ষা করা হবে। ভারতীয় সেক্টর সদর দপ্তর এক স্থানে না থাকলে তাদের মধ্যে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। লজিস্টিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলোর মধ্যে মুক্তি বাহিনীর বেতন, পোশাক, রেশন, চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১ এপ্রিল স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সামরিক অফিসারের পরবর্তী করণীয় এবং ২ ও ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সামরিক বিষয়সমূহ সমন্বয় সাধনের জন্য প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়াপাড়া (হবিগঞ্জ) চা বাগানে।

৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ব্যবস্থাপকের বাংলোতে সভা শুরু হয়। এখানে উপস্থিত হন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রয়োজনে সেনা বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের সদস্য এবং সাধারণ সশস্ত্র জনতাকে নিয়ে মুক্তি বাহিনী গঠন করা হবে। কর্নেল ওসমানী মুক্তি বাহিনীর

প্রধান থাকবেন। মুক্তি যুদ্ধের সুবিধার্থে বাংলাদেশকে মোট চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হবে। যারা নেতৃত্ব থাকবেন ঃ

১। মেজর জিয়াউর রহমান (চট্টগ্রাম অঞ্চল)
২। মেজর কে এম শফি উল্লাহ (সিলেট অঞ্চল)
৩। মেজর কে মোশাররফ (কুমিল্লা অঞ্চল)
৪। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (কুষ্টিয়া অঞ্চল)

সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা বারুদের অভাব মেটানের জন্য ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করবেন।

যে কোনো যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে মূলত কার্যকর আদেশ নিয়ন্ত্রন এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভার প্রাপ্তির ওপর। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর তিন মাস গত হওয়ার পরও ভারতীয় বাহিনী বা অন্য কোনো জায়গা থেকে প্রত্যাশিত অস্ত্রসস্ত্র এবং লজিস্টিক না পাওয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে পাক-বাহিনী প্রাথমিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার পর মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশে গোলন্দাজ ও সাজোয়াসহ পাঁচটি সামরিক ডিভিশন মোতায়েন করতে সক্ষম হয় এবং ধীর গতিতে তাদের দখল দারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যা জুন মাসের মন্ত্রি-সভায় আলোচিত হয় এবং ১১ জুলাই সেক্টর কমান্ডারদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তি-যুদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে চলে আসে। এবং সশস্ত্র যুদ্ধের রূপরেখা রণনীতি ও রণকৌশলের ফলে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি বাংলাদেশ বাহিনীর অনুকূলে চলে আসতে থাকে। বিভিন্ন জেলায় পাক বাহিনী পরাজিত হতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধের ফলে পাক বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে তারা রাজাকার, আলশামস, আলবদরদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে ঢাকার দিকে চলে আসতে থাকে।

বাংলাদেশের ৯ মাস যুদ্ধের মধ্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস ছিল বিজয়ের মাস, এই মাসে এক এক করে মুক্তিযুদ্ধও যৌথ বাহিনী বিভিন্ন জেলা মুক্ত করতে থাকে।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আমাদের মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাসের এক মোড়ঘোরানো তারিখ। সেদিন পাকিস্তান ভারতীয় বিমান ঘাঁটি গুলোতে বোমাবর্ষণ ও পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন স্তানে আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। অতপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয়। সেই সাথে সূচিত হয় পূর্ব রণাঙ্গনে বাংলাদেশ ভারত মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতার চূড়ান্ত বিজয়।

সেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণ শেষে তিনি জানতে পারেন তার দেশের পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে নয়টি ঘাঁটির ওপর বোমা বর্ষণ শুরু করেছে পাকিস্তান বিমান বাহিনী। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন দিল্লি বিমান বন্দরে। ২ঘন্টার মধ্যে দিল্লি বিমান বন্দরে নেমে গাড়িতে করে সোজা পার্লামেন্ট ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। তাঁর গাড়ির বহরে ছিল, তার দুই পুত্র ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা। মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক শেষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন মধ্যরাতের কিছু পরে। তিনি ভাষনে বললেন "পাকিস্তান এতদিন বাংলাদেশে যে নৃশংসতা চালিয়ে আসছিল, এখন তারা সেটিকে পরিণত করেছে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্নক যুদ্ধে।"

৪ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটি বিবৃতি পেশ করেন। এই বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাড়ানোর ঘোষণা দেন। একই তারিখে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক স্বীকৃতি চেয়ে পত্র লেখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থল বাহিনী একযোগে চারটি অঞ্চলে অগ্রাভিযান শুরু করে।

১। পূর্বে ত্রিপুরা থেকে সিলেট, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালীর দিকে।

২। উত্তরাঞ্চলে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া অভিমুখে।

৩। পশ্চিম দিক থেকে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর অভিমুখে।

৪। মেঘালয়ের তুরা থেকে জামালপুর ময়মনসিংহ অভিমুখে। ৩-৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই চার ফ্রন্টে অনেক এলাকা মুক্ত করে মিলিত বাহিনীর বিজয় অভিযান চলতে থাকে ঢাকা অভিমুখে। এরই সমান্তরালে চলতে থাকে কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধ, ৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক বসে কিসিঞ্জার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের দাবি সংবলিত মার্কিন প্রস্তাব পেশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা এবং ভারত ও পাকিস্তানের সেনা বাহিনী নিজ নিজ সীমান্তের ভেতর ফিরিয়ে নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবকে এক তরফা অভিহিত করে ভেটো প্রয়োগ করে সোভিয়ত ইউনিয়ন।

সভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি ও পাকিস্তানের

সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করলে চীন তাতে ভেটো দেয়। অন্য দেশগুলো ভোট দানে বিরত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির ও সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবের মতোই একটি প্রস্তাব আসে ৮টি দেশের পক্ষ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে দ্বিতীয় বারের মতো ভেটো দেয়। এর মধ্যে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

কিসিঞ্জারের নেতৃত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ সামরিক হস্তক্ষেপের উপায় খুঁজতে থাকে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর, উত্তর দিক থেকে। চীন দেশের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং এসবের বিপরীতে ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েত সাবমেরিন ও রণসজ্জার মধ্যেই মুক্তিবাহিনীও ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত যুদ্ধাভিযান পাক বাহিনীকে চূড়ান্ত পরাজয়ের নিকটে নিয়ে যায়।

অবশেষে ইয়াহিয়া চক্রের কূটনৈতিক দুরভিসন্ধি থেকে ৩ ডিসেম্বর ভারতকে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধে জড়িয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা ভন্ডুল হয়ে যায়। একদিকে বাংলাদেশের নিপীড়িত সংগ্রামী জন সাধারণের প্রতি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থনের কারনে, অন্য দিকে মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সফল যুদ্ধাভিযানের ফলে ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হলো আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

ভারতের লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর বিবৃতি:
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতের লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি যা ইংরেজী থেকে অনুদিত এবং সংক্ষিপ্ত, "মাননীয় স্পিকার আজ সকালে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তান বিমান বাহিনী আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং আমাদের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রের ওপর আক্রমন চালিয়েছে। সামান্তরাল ভাবে তাদের স্থল বাহিনীগুলো পশ্চিম সীমান্তজুড়ে আমাদের অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষন করেছে। তাদের প্রচারযন্ত্র সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে এই অভিযোগ প্রচার করেছে যে, ভারত তাদের ওপর আক্রমন ও আগ্রাসন শুরু করেছে। খবরটি আমার কাছে পৌছায়, ঠিক যখন আমি কলকাতা ত্যাগ করছিলাম। দিল্লিতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সহকর্মী ও বিরোধী দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি। আমরা সবাই এক মত এবং এই সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, জাতির স্বাধীনতা রক্ষা

করতে হবে এবং সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আগ্রাসী আঘাতকারী শক্তিকে প্রত্যাঘাত করতে হবে।

নয় মাসেরও অধিক সময় ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার বর্বুরোচিতভাবে দলীত করে চলেছে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি ও মৌলিক মানবাধিকার। তাদের উপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যেসব অপরাধ করে চলেছে, প্রতিহিংসা প্রসূত হিংস্রতার দিক থেকে সেগুলো তুলনাবিহীন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুৎ করা হয়েছে। আমাদের দেশে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় এক কোটি মানুষকে। পুরো একটি জাতির এই নিচ্ছিন্নকরণ অভিযানের প্রতি এবং আমাদের নিরাপত্তার ওপর এই হুমকির প্রতি আমরা বার বার বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সবখানেই মানুষ সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। ভারতের উপর অর্থনীতি ও অন্যান্য চাপ এবং বিপদ উপলব্ধি করেছি।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্রোধান্ধ হয়ে উঠেছে, কারণ বাংলাদেশের জনগণ এমন কিছু মূল্যেবোধের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে আন্দোলন সংগ্রামে নিবেদিত হয়েছে, সেসব উপলব্ধি করতে সামরিক বাহিনী অক্ষম: এবং সেইসব মূল্যবোধ তারা দলীত করতে চলেছে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশেই।

মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতার সাফল্য যতই বেড়েছে পাকিস্তান বাহিনী ততই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের ঐতিহ্য-নিপীড়ক স্বৈরাচারীদের পাশে দাঁড়ানো নয়। বরং নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ানো। এবং সেই কারণেই তাদের রোষানল এখন বর্ষিত হচ্ছে আমাদের উপর।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত আগ্রাসনকে পাকিস্তান বিস্তৃত করেছে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপে। আমরা শান্তির পক্ষে, কিন্তু আজ শান্তি বিপন্ন। শান্তি রক্ষা করতে হবে। আজ আমরা লড়াই করছি জাতীয় ভূখন্ডের অখন্ডতা ও জাতিয় মর্যাদা রক্ষার লক্ষে। সর্বপরি আমরা লড়ছি আমাদের লালিত আদর্শ ও শান্তির রক্ষার স্বার্থে।

দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের প্রতিটি দিনই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারপরও কিছু তারিখ ঐতিহাসিক যেমন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন, ১১ জুলাই সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠক, ১ আগস্ট দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, ৩ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি, ৪-১৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশকে নিয়ে বিতর্ক, ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা, ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়।

পন্ডিত রবি শংকরের সাথে বিশ্ব বিখ্যাত ব্যান্ড বিটল্‌সের শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ও সহ-শিল্পীবৃন্দ।

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও তহবিল সংগ্রহের জন্য পন্ডিত রবি শংকরের অনুরোধে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে **"দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ"** নামের এক অবিস্মরণীয় কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত ব্যান্ড বিটল্‌সের শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক জজ হ্যারিসনের। বর্তমানে তিনি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁর অবদানের কথা গভীরভাবে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে তাকে সম্মানিত করেন। ২০০৫ সালের পুনঃপ্রচারিত দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ডিভিডি এ্যালবাম থেকে পাওয়া অর্থ দান করা হয় ইউনিসেফে। এখনো তা ব্যয় হচ্ছে বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে।

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়ার সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করেছিল অনেক গুণিজন । এই লেখাটি ১২/১২/২০১২ তারিখে লেখার সময় টিভি সংবাদ

শুনতে পাই বেনারসে জন্ম নেওয়া এই মহা পুরুষ পন্ডিত রবিশংকর যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বৎসর। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় অকৃত্রিম বন্ধু বাংলাদেশকে কিভাবে সাহায্য করেছিল তারই কিছু বর্ণনা।

পন্ডিত রবি শংকর একজন বাঙ্গালী। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে যেসকল অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে যান। কারণ বাংলাদেশের প্রায় ৮০/৯০ লক্ষের উপরে মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। রবি শংকরের আদি পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের যশোর কালিয়ায়। পাকিস্তানিরা অংসখ্য লোককে হত্যা করেছে। তিনি মনে করতেন এদের মধ্যে তার দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি, আত্মীয়, মুসলমান বন্ধুসহ বহু ঘনিষ্ঠ জন রয়েছে। এমন কি তার গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পরিবার পরিজনকেও হত্যা করা হয়েছে। তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে সবশেষ করে দেওয়া হয়েছে। যার কারণে মার্চ-৭১ থেকে পরবর্তী চলমান ঘটনা প্রবাহ তাঁকে বেদনা বিদ্ধ করেছে, কষ্ট দিয়েছে। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

জুন মাসের শেষের দিকে রাগা এ্যালবামের কাজের জন্য জর্জ হ্যারিসন ক্যালিফোর্নিয়ায় আসেন। এসময় পন্ডিত রবি শংকরের মন ছিল খুব অশান্ত ও বিচলিত। বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিছু করতে চান। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বহু সংস্থার সাথে যোগাযোগ করলেন। তাদেরকে পরিবেশনা বাবদ ভালো সম্মানী দিতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন বৃহৎ পরিসরে এমন কিছু করতে যাতে বিশাল অংকের তহবিলের জোগান হবে। পাশাপাশি জনসচেতন মূলক প্রচারণা পাবে। একারণে তিনি চিন্তা করলেন জর্জ হ্যারিসনকে নিয়ে একটা কনসার্ট করার কথা। অবশেষে তিনি বলার পর জর্জ তাঁর আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন। বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একজন বাঙ্গালী হিসাবে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বই সাময়িকী দিলেন, এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। ফ্র্যান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, নরওয়ে, আমেরিকাসহ বহু দেশের সংবাদপত্র বাংলাদেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত লক্ষ লক্ষ মানুষের সীমাহীন কষ্ট ও দুর্দশা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছিল। এ লেখাগুলো পড়ার পর জর্জের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এরপরে জর্জ জানায়, এই মহান অনুষ্ঠানে সাহায্য করতে পারলে এমন কি পরিবেশনার সুযোগ পেলে খুশি হবেন। তার পরই কাজ দ্রুত এগোতে থাকে। এরপর হ্যারিসন, রিঙ্গোষ্টার ও লিওন রাসেলের সঙ্গে কথা বলেন এবং পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের বিখ্যাত সব সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানালেন। এরপর

মিস্টার ক্লেইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে এই কনসার্টের ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দিলেন। প্রত্যেকে সহমর্মিতা নিয়ে এগিয়ে এলেন। ডিলান কেও পাওয়া গেল। সবাই একসঙ্গে যুক্ত হয়ে উদ্বেলিত ছিলেন। মাত্র চার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে এই মহা আয়োজন সম্পন্ন হলো। এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এধরনের বিশাল একটা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং সফলভাবে তা সম্পূর্ণ করা বিশ্ব বিনোদন জগতে একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড।

পন্ডিত রবি শংকর এই কনসার্ট এর ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, এজন্য সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ। জর্জের "বাংলাদেশখ্যাত" গান আমার একটি পরিবেশনা, কনসার্ট নিয়ে বানানো প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রকাশিতব্য এ্যালবাম এই সব কিছুর মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা সহায়তা তহবিলে যোগ হবে। প্রায় এক কোটি শরনার্থী এবং তাদের মধ্যকার অগণিত শিশুর সাহায্যার্থে জোগাড় করা এই অর্থ যদিও মহাসাগরের এক ফোঁটা জলের সমান। এদিয়ে হয়তো তাদের দুই থেকে তিন দিনের অন্নের সংস্থান করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা মূখ্য বিষয় নয়, সবচেয়ে বড় কথা তহবিল সংগ্রহের বাইরে কনসার্টে আসা আগত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ৪০-৫০ হাজার ছিল তরুণ-তরুণী। বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং সেখানে মানুষ কী দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছে সে বিষয়ে ধারণা দিতে পেরেছেন। "যত দূর সম্ভব, প্রত্যেকের কাছে দায়িত্ব পৌছে দেওয়ার যে চেষ্টা, যে আকুতি, এই কনসার্ট ছিল তারই একটা স্ফুলিঙ্গ।"

"জর্জ হ্যারিসন যেভাবে জড়িয়ে গেলেন :

১৯৭১ সালের লস অ্যাঞ্জেলেসে রাগা এ্যালবাম কাজ করছেন। তখন বরিশংকরের সাথে আলাপ হয়, তিনি একটা কনসার্ট করতে চান। সাধারণত যেমনটা করেন তার চেয়েও বড়, যাতে বাংলাদেশের অভুক্ত মানুষের জন্য অন্তত ২৫ থেকে ৫০ হাজার ডলার তোলা যায়। জর্জ হ্যারিসন কোনোভাবে সাহায্য করতে পারেন কিনা জানতে চাইলেন। যেমন কনসার্ট শুরু করে দিয়ে এলেন অথবা পিটার সেলার্সকে নিয়ে এলেন যে কোনো ধরনের সাহায্য। তারপর রবিশংকর বিভিন্ন পত্রিকা সাময়িকীর যুদ্ধ আর দারিদ্র্য সংক্রান্ত কাটিংস দেওয়া শুরু করলেন। এবং বিষয়টি আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করলেন হ্যারিসনের মনে হলো তাকে (রবিশংকরকে) সাহায্য করা উচিত।

বিটল্‌সের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যা কিছু করো, তাহলে বড় করেই করো, আর মিলিয়ন ডলারই বা নয় কেন? এভাবে জর্জ জড়িয়ে গেলেন। পরে যা "কনসার্ট ফর

বাংলাদেশ" হয়ে উঠবে, তিন মাস ধরে টেলিফোনে দাঁড় করলেন। কাজটা সম্ভব করার জন্য এরিকের (ক্ল্যাপটন) সঙ্গে কথা বললেন। সামান্য মহড়াই তারা কনসার্টটি করলেন। নানা অসুবিধার মধ্যে অগোছালোভাবে কনসার্টটি করা হলো। একজন ভারতীয় জ্যোতিষী আগস্টের শুরুটা শুভ হবে বললেন। এবং আগষ্টের দিনটাও পেয়ে গেলেন। তখন ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনও ছিল ফাঁকা। সে স্থান ভাড়া করলেন। তারপর কনসার্টটা করা হলো। দুটো অনুষ্ঠান করে ছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠানের সব টিকেট বিক্রি হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় কনসার্ট করলেন। সব কিছুই ভালো ভালো সম্পন্ন করেছিলেন। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে শোনাও গিয়ে ছিল চমৎকার। সাউন্ডমিক্সের জন্য ব্যান্ডের প্রোডাকশনের ব্যক্তিদেরই পেয়েছিলেন। লাইটিং-এর জন্য ছিল চিপ মংক। আর ঘটনাকে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন অ্যালেন ক্লাইনের লোকজন। ছবিটা ভালো ভাবে করা যায়নি। বড় বড় সাদা লাইটের নিচে প্রথম কনসার্টের গরমে সেদ্ধ হওয়ার দশা। মঞ্চে কোনো স্টেজ লাইট ছিল না। চীপের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে সে জানান, ফিল্মের লোকজন তাকে শুধু সাদা আলো জ্বালিয়ে রাখতে বলেছেন। তাদের একজন বলেন, না-না চলচিত্রায়নের জন্য আমাদের স্টেজ লাইটের দরকার নেই। মনে মনে সে ভেবেছিল "আমাদের জিনিস তো পেয়েই গেছি। দ্বিতীয় শোতে তারা রঙিন আলো ব্যবহার করুক। হ্যারিসনের বিবেচনায় দ্বিতীয় শোটা লাইটিং ছিল খুবই ভালো। কিন্তু চলচিত্রায়ন ঠিক মতো হলো না। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের ঠিক পেছনের একটি ক্যামেরার ফিল্মের পুরোটাই কালো, মাঝখানে শুধু একটা বিন্দু তাতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দালানের ডান দিকে মাঝ বরাবর রাখা আরেকটি ক্যামেরা পুরো সময়েই ছিল আউট অব ফোকাস। ক্যামেরাটিতে ত্রুটি ছিল, দালানের বামদিকে মাঝপথে আরেকটি ক্যামেরা ছিল, এটার সামনে আবার পুরো সময়টায় ঝুলছিল বড় বড় তার। ফলে মঞ্চের সামনে রাখা ক্যামেরা আর শব্দ ধারণে অক্ষম হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা ছিল। আমাদের ভরসা আপনারা যে ছবিটা দেখেন সেটা অনেক চেষ্টার ফল। যেমন ধরুন ছবিতে আমরা প্রথম গান "ওয়াহ ওয়াহ" তে ১২টা কাট আছে, ১২টা জোড়া তার মধ্যে ১২টা আসল নয়টা নকল। নানান জায়গার আলাদা আলাদা শব্দ জুড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, কিছু অংশে আবার ব্লো-আপ বর্দ্ধিত করতে হয়েছে। ফলে সেই জায়গাগুলোর ছবি খুব দানাদার আরও অনেক আছে নেতিবাচক। কিন্তু শিল্পীরা সবাই ছিল খুব সদয়। তিনি তাদের এই নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে কারও যদি রেকর্ড বা ফিল্ম পছন্দ না হয়, তাহলে তারা এটা থেকে বিরত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। তিনি চাননি এসব কিছুর জন্য তাদের বন্ধুত্বের অবসান হোক। এটা

কিন্তু ক্লাইনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সে কাজটা ঠিক মতো গুছিয়ে করেনি। কনসার্টের আগে না গিয়ে সে ইউনিসেফের কাছে গিয়েছিল পরে। তারপর মার্কিন কর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করে তাদের আইনজীবীরা। ওরা এখনো বলে "আমরা ভেবেছিলাম তোমরা হয়তো নিজেদের লাভের জন্য এটা করেছ।" বছরের পর বছর টাকা আটকে রাখা হয়। যাহোক, আসল কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের ঘটনাবলির ব্যাপারে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা যখন কনসার্টের প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিনরা তখন পাকিস্তানকে অস্ত্র পাঠাচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু সংবাদপত্রে কোনো শিরোনাম নেই।

জর্জ হ্যারিসনের প্রতি সেই ভালোবাসা থেকে ২০১১ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারিতে স্ত্রী অলিভিয়া হ্যারিসন ঢাকার আসেন। এবং বলেন "১৯৬৫ সালে রবিশংকরের সঙ্গে পরিচয় হয় জর্জ হ্যারিসনের। জর্জ তিন বছর সেতার নিয়ে অনুসরণ করেছিলেন রবিশংকরের কাছে। রবিশংকরের মাধ্যমে জর্জ বাংলাদেশের সঙ্গে আত্মীক সম্পর্কে গড়ে উঠে। একাত্তরে রবিশংকর মনের যন্ত্রণার সঙ্গী হয়ে কনসার্টের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিল জর্জ। সব সময় ওকে বলতে শুনেছি। বাংলাদেশের জন্য তার আরও কিছু করার ছিল। অলিভিয়া হ্যারিসন "জর্জ "হ্যারিসন ফান্ড ফর ইনিসেফ" এর প্রতিষ্ঠাতা ফেব্রুয়ারি ১১ তারিখে তিন দিনের জন্য ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখতে এসেছিলেন ঢাকায়। তিনি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দরিদ্র শিশু ও কিশোরদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ দেখছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শিশুদের জন্য কিছু কর্মসূচি চলে জর্জ হ্যারিসন ফান্ডের সহায়তায়, ভবিষ্যতে হাওর ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশু কিশোরদের নৌকাস্কুল কর্মসূচির জন্য সহায়তা নিয়ে অলিভিয়ার সঙ্গে কথা হয়েছে ইনিসেফের। এটাই ছিল তাঁর প্রথম বাংলাদেশ সফর। বছরের পর বছর ধরে তিনি তাঁর প্রয়াত স্বামীর শুরু করা কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছেন। যে কাজের সুফল পাবে বাংলাদেশের শিশুরা।

২০০৫ সালে পুন:প্রচারিত দ্য কর্নসার্ট ফর বাংলাদেশ ডিভিডি উপলক্ষে সঙ্গে প্রকাশিত পুস্তিকায় ইউএসএ ফান্ড ফর ইউনিসেফের সভাপতি চার্লস লিওনের লেখা থেকে জানা যায়, কনসার্টের টিকিট বিক্রি থেকে সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় আড়াই লাখ ডলার ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর প্রকাশিত তিনটি রেকর্ডসহ এ্যালবাম এবং ১৯৭২ সালের মার্চের কনসার্ট নিয়ে তৈরি ফিল্ম থেকে আয় নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। পরবর্তী দশকগুলোতে এসব অর্থ দান করা হয় ইউনিসেফ

এবং ১৯৭২ সালের মার্চের কনসার্ট নিয়ে তৈরি ফিল্ম থেকে আয় নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। পরবর্তী দশকগুলোতে এসব অর্থ দান করা হয় ইউনিসেফ পরিচালিত শিশুদের কল্যাণমূলক তহবিলে। এসব কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পন্ডিত রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসন এবং ওই কনসার্টের শিল্পীরা বাংলাদেশের প্রতিটি প্রজন্মের নিকট চিরদিন বেঁচে থাকবে। আমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারবো মাইকেলভসের সম্পাদিত "কানসার্ট ফর বাংলাদেশ" এর পরিচিত মূলক পুস্তিকা ও জর্জ হ্যারিসনের I, Me, Mine গ্রন্থ থেকে।

বাংলাদেশকে নিয়ে জর্জ হ্যারিসনের বিখ্যাত গানের বাংলা অনুবাদ :

বন্ধু আমার এল একদিন
চোখ ভরা তার ধূ ধূ হাহাকার
বলল কেবল সহায়তা চাই
বাঁচাতে হবে যে দেশটাকে তার
বেদনা যদি বা নাও থাকে তবু
জানি আমি, কিছু করতেই হবে
সকলের কাছে মিনতি জানাই আজ আমি তাই
কয়েকটি প্রাণ এসো না বাঁচাই
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
দেখছি সেখানে সকলই ধ্বংস
কতশত প্রাণ মরে নিঃশেষ
দেখেনি এমন বেদনা অশেষ
তোমরা সবাই দুহাত বাড়াও আর বুঝে নাও
মানুষগুলোকে সহায়তা দাও
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
দেখনি কখনো এত দুর্যোগ
দেখছি সেখানে সকলই ধ্বংস
দেখিনি কখনো এত দুর্ভোগ
দোহাই তোমরা ফিরিওনা মুখ,
বলো এই কথা
মানুষগুলোকে দেব সহায়তা
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
মনে হবে সে তো কোন সীমানায়

৫১

আমরা কোথায়
কী করে বা একে ছুড়ে দিই ফেলে
এত যে বেদনা রাখি দূরে ঠেলে
দেবেনা তোমরা ক্ষুধিতকে রুটি
সামান্য দুটি
মানুষ গুলোকে সহায়তা দাও ॥

এই গানে জর্জ হ্যারিসনের বন্ধু "পন্ডিত রবিশংকর"
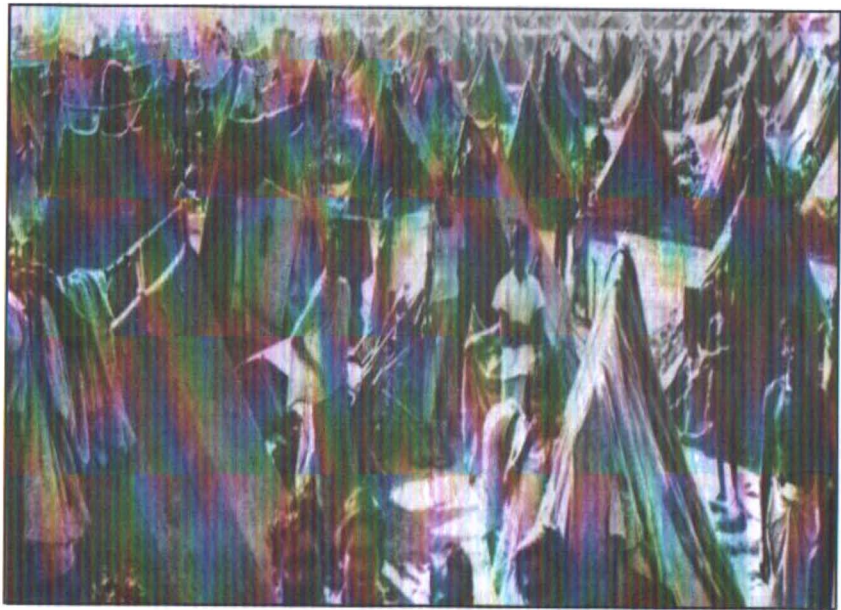
ভারতে শরণার্থী শিবির।

এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশ বানী, বিবিসি, "ভয়েস অব আমেরিকা" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণা চালায়। সারা পৃথিবীর মানুষ উক্ত বেতার কেন্দ্রগুলো থেকে বাংলাদেশের খবর সংগ্রহ করতো। কখন কোন সময় এসকল বেতার কেন্দ্রে খবর প্রচার হতো আমেরিকাসহ ঢাকা থেকে বহিস্কৃত বিদেশে সাংবাদিকদের প্রতিবেদন সারা বিশ্বে ব্যাপক আড়োলন সৃষ্টি করে। ২৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী কর্তৃক লোকসভায় উত্থাপিত বাংলাদেশ সম্মন্ধীয় রেজুলেশন "Profound Sympathy for and Solidarity with the People of East Bangle in their Struggle for Democratic Way of Life" গৃহীত হয়। ইন্দিরাগান্ধী আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করতে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। কিন্তু আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় সন্তোষ জনক পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে পাক সেনাদের রাইফেল, কামান, মেশিনগানের শব্দে কেঁপে উঠে বাংলাদেশের প্রতিটি শহর। তারা যন্ত্রতন্ত্র এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-সামস্ শান্তি কমিটির লোকদের সহায়তা মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ চালায়। যা ছিল মানব ইতিহাসে অত্যন্ত লোমহর্ষক ঘটনা। ভীত শন্ত্রস্ত ও জীবনের ভয়ে বাংলার মানুষের মধ্যে দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়ে। ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, ফেনী, সিলেট, প্রভৃতি জেলার মানুষের জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হয়ে ওঠে প্রধান আশ্রয় ঘাঁটি।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের আদম শুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৫৬,৮২২ জন। অন্য দিকে আগরতলা শহরের লোক সংখ্যা ছিল ৫৯,৬৮২ জন। মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ আশ্রয় নিতে গিয়ে আগরতলার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। আগরতলার ধর্মতলায়, বিলোনিয়া, আগরতলা, কৈলাশপুর, কসবা ও সোনামুড়া সীমান্তের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শরণার্থীরা আশ্রয় নেয়। ওই সময় ত্রিপুরা রাজ্য সরকার চরম সংকটে পড়ে। কারণ তাদের রাজ্যে বসবাসরত মানুষেরও অধিক বাঙ্গালি সেখানে। শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল এই বাড়তি মানুষের খাদ্য, চিকিৎসা, ঔষধ, আসবাবপত্র প্রভৃতি চাহিদা পূরণে ত্রিপুরা সরকার অপারগ ছিল। ওই সময় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেখানকার জনগণ বন্ধুর মতো এদেশের শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আগরতলায় শরণার্থী শিবিরে একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি করা হয়। এই নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হতো। ওই ক্যাম্প থেকে সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। তিনি নিয়মিত শরণার্থী শিবিরে গিয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের খবর নিতেন।

ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাববুদ্দিনের একটি চিত্রকলা প্রদর্শনী হয়। যা সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। অন্য দিকে পশ্চিম বঙ্গে শরণার্থী শিবির থেকে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধা শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ। এদলে যুক্ত ছিলেন শিল্পী ওয়াহিদুল হক, সানজীদা খাতুন, মুস্তফা মনোয়ার, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ। তারা গান গেয়ে, আবৃত্তি করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতেন। কেবল জনমত সৃষ্টিই নয়, তারা আর্থিক সহযোগিতা তুলে মুক্তি যোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছিলেন। একাত্তরের শরণার্থী শিবির থেকে রচিত হয়েছিল যুদ্ধ জয়ের দীপ্ত শপথ (বীজমন্ত্র)। সেখানে বাংলাদেশের স্বার্থে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল এক সময়ের পূর্ব বাংলার মানুষ। শরণার্থী শিবির থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে প্রাথমিক কার্যক্রম ও পরিচালিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের থেকে চরমপত্র, দেশাত্মকবোধক গান, সংবাদ বাংলার মানুষকে সাহস জুগিয়েছিল, উজ্জীবিত করে রেখেছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল মুক্তি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষনের অন্যতম ঘাটি। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অসাধারণ সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্রুত ত্বরান্বিত হয়। শরণার্থী শিবিরে মুক্তির গানের শিল্পীরা তারেক মাসুদ এবং তার স্ত্রী ক্যাথরীনের ঘুরে ঘুরে গান পরিবেশন করে অসহায় মানুষকে আনন্দ জাগিয়েছিল, যা পরবর্তীতে লিয়ার লেবিনের থেকে সংগৃহীত প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে মুক্তির গান ছবি তৈরি করে। তারেক মাসুদ আজ আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই। ২০১১ সালে সড়ক দূর্ঘনায় মিশুক মুনির সাথে অকাল প্রাণ হারায়।

পাক বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা।

১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদে
সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনীতির লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হয়েছিল। সেই লড়াইয়ে পরাজিত হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতো তা নয় তবে বিলম্বিত হতো।
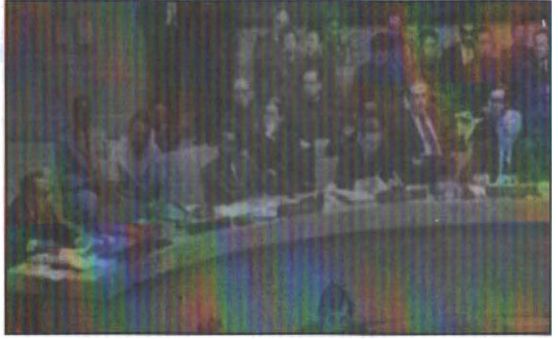
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ নিয়ে বিতর্ক

ভারত প্রথম দাবি তোলে ১৯৭১ বাংলাদেশে গণহত্যা ঠেকাতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ, কিন্তু পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। কিন্তু জুন-জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে অনুধাবন করতে পেরেই জাতিসংঘের দ্বারস্ত হয় পাকিস্তান নিজেই। কিন্তু ততদিনে ভারতের অবস্থান পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না, এই যুক্তিতে যে কোনো রকম শান্তিরক্ষী বাহিনী বা পর্যবেক্ষনের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র চীন ও অন্যান্য পরাশক্তি পাকিস্তানের পক্ষে। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা বাংলাদেশের পক্ষে। এই দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দিতায় কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে জাতিসংঘ। এদিকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ এই বিষয়ে একবারও মিলিত হতে পারেনি। ৭১-এ জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন "উথানট"। যুদ্ধের হুমকি দেখা দিলে তার থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব জাতিসংঘের। আর সে জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো যুদ্ধরত দেশ সমুহের মধ্যে আশুযুদ্ধ বিরতি। আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এঅবস্থায় যুদ্ধ বিরতি বা সীমান্ত সংঘর্ষ ঠেকাতে আনর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যায় এর সুফল নিবে একমাত্র পাকিস্তান। এমতাবস্থায় যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের চেষ্টা ঠেকানো ভারতীয় কূটনীতির প্রধান লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

৩ ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আনুষ্ঠানিকভাবে।

অতপর নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে অপেক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না। ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম বৈঠক বসে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এই দুই সদস্য অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তোলে। শুধু যুদ্ধ বিরতি নয়, যার যার সীমান্তের পেছনে সেনা ফিরিয়ে নিবার দাবিও তোলে। এর বিপক্ষে একমাত্র কণ্ঠস্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত জোটভুক্ত অস্থায়ী সদস্য পোল্যান্ড, তারা পাল্টা প্রস্তাব দেয় সবার আগে দরকার পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান। সেই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। যার ফলে সংকটাপন্ন রাজনৈতিক সমাধান হবে। তার সাথে যুদ্ধেরও অবসান হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

ডিসেম্বর ৪ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১২ থেকে ২১ ডিসেম্বর আরো ১৩টি। প্রতিদ্বন্দী পরাশক্তির বিরোধিতার কারণে ২১ ডিসেম্বরের আগে কোনোটিই গৃহীত হয়নি।

নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ার পর সোমালিয়া প্রস্তাব তোলে। বিষয়টি সাধারণ পরিষদে পাঠানো হোক। প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার মতো সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা না থাকলেও কিন্তু এর গৃহীত প্রস্তাবের রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। ৭ ডিসেম্বর একটানা ১০ ঘণ্টা বিতর্কের পর যে প্রস্তাব গৃহীত হলো তাতে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ও সব সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হলো। রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়ে একটি পাল্টা প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্থাপন করে। কিন্তু পর্যাপ্ত সমর্থনের অভাবে সেই প্রস্তাব ভোটাভুটিতে তোলা হয়নি।

এদিকে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি জানায়। এর ফলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিতর্ক বদলে যায়। স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভক্তি কেবল সময়ের ব্যাপার। যুদ্ধের ময়দানেও পাকিস্তানি চূড়ান্ত ভাবে কোণঠাসা। এ অবস্থায় আমেরিকার জন্য প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল, পশ্চিম পাকিস্তান যাতে ভারতের দখলে চলে না যায় বা তার ভৌগোলিক সংহতি বিপন্ন না হয় তা নিশ্চিত করা। এদিকে চীনের ওপর চাপ দিতে থাকে পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে, অন্য দিকে মার্কিন কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গোপনে জর্দান ও ইরানের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরও চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভের কাছে এক বার্তা পাঠায়। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ না হলে

তার দায় ভারত ও মস্কের উপর পড়বে। আমেরিকান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিসিঞ্জার ও ওয়াশিংটনে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে ডেকে বললেন, ভারতকে নিরস্ত্র না করতে পারলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মস্কো ভ্রমণ বাতিল করা হবে। তাতেও কাজ না হওয়ায় শেষ চেষ্টা হিসেবে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্য আনবিক অস্ত্রবাহী ৭ম নৌবহর পাঠানোর নির্দেশ পাঠালেন নিক্সন।

আমেরিকার সামরিক হুমকি মোকাবেলার ক্ষমতা তখন মস্কোর ছিল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তারা ভলাদিভস্তক থেকে একটি রণতরী ৮ম নৌবহর পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এদিকে জাতিসংঘে ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমশ একা হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নে বার বার প্রস্তাব উঠছে। প্রতি বারেই সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দিচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এসময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মোট ৭ বার তাদের না জ্ঞাপক ভোট প্রদান করে। এ ব্যাপারটা তাদের জন্য ক্রমশ অস্বস্থিতিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনোরকম যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত হওয়াও তার জন্য অসম্ভব ছিল। বস্তুত এই সময় সোভিয়েত কূটনীতির প্রধান লক্ষ ছিল যথা সম্ভব কালক্ষেপণ। মস্কো থেকে এক বার্তায় খোদ ব্রেজনেভ জানালেন, ভারত তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তান দখলের কোনো পরিকল্পনা তার নেই। সে উদ্দেশ্যে ভারতের ওপর চাপ তারা বজায় রাখবেন বলেও আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু নাটকীয়ভাবে ১৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারত যুদ্ধ প্রশ্নে ফের আলোচনা শুরু হলে পোল্যান্ড খসড়া আকারে একটি প্রস্তাব রাখে। তাতে বলা হয়, রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষে ৭২ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হবে। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী প্রত্যাহার শুরু হবে। এবং সেখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। যেহেতু প্রস্তাবক পোল্যান্ড, ফলে ভাবা যায় সোভিয়েত সমর্থন ছিল। দেশের অখন্ডতা চাইলে পাকিস্তান এই প্রস্তাব মেনে নেয়ার কথা। বিজয় যখন দ্বারপ্রান্তে সে সময় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করা ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের জন্যই তা হবে আত্মঘাতী স্বরূপ। পরামর্শের জন্য আরও সময়ের দরকার এই যুক্তিতে ১৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে এই ব্যাপারে কোন বৈঠক হয়নি। ১৫ তারিখে যখন ঢাকায় পাকিস্তান সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে তখন পরিষদে সভা বসল। এই সভায় যদি পোল্যান্ডের প্রস্তাব গৃহীত হতো, তাহলে যুদ্ধের কূটনীতি কোন দিকে গড়াত তা বলা কঠিন ছিল। পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিল যে দেশের সদ্য নিযুক্ত উপ-প্রধামন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী

জুলফিকার আলী ভুট্টো। পরিষদে এক উত্তেজিত ভাষণে সেই খসড়া প্রস্তাব বা অন্য কোনো কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিড়ে বেরিয়ে গেলেন। সে দৃশ্য আজো আমরা টিভি পর্দায় দেখতে পাই।

একাত্তরের ১৫ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জুলফিকার আলী ভুট্টোর দেওয়া ভাষণের অংশ বিশেষ। তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে একটা ভোটার ফলে আমরা বিরক্ত বোধ করছি। আসুন আমরা নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারন পরিষদের অক্ষমতা ও অকার্যকর তার সৌধ বানাই। যেমন কর্ম তেমন ফলইতো ফলবে। বাইবেলের ওই কথাটা স্মরণ করুন, আজ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এমন হলো। আজ আমরা গিনিপিগ কিন্তু আগামী দিনে গিনিপিগ হবে অন্য কেউ। তখন দেখবেন কী হয়। ঘটনার শৃঙ্খলা কীভাবে নিজেকে উম্মোচন করবে সেটাও আপনারা দেখবেন। আপনারা আমাদের মুখ ভোতা করতে চান, আমরা তা হতে দেব না।
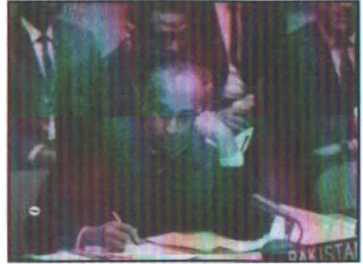
নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টো।

পূর্ব-পাকিস্তানে ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা অন্য দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। দখলদার বাহিনী হিসেবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপস্থিতি প্রতিক্ষণে মুসলমানপ্রধান বাংলাকে ভয়ংকরভাবে মনে করিয়ে দিতে থাকবে যে, তারা হিন্দু দখলদারির অধীন, আর আপনারা এর পরিণাম নিজ চোখেই দেখবেন। দেখবেন কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়। বেশ তো তারা থাকুক না অসুবিধা কী? তারা থাকুক, আস্ফালন করুক। যদি তারা পূর্ব-পাকিস্তান নিয়ে নিতে চায়, তবে তারা দখলদার বাহিনী হিসেবেই থাকুক। তারা তো দখলদার বাহিনী, কিভাবে তাদের মুক্তিদাতা বলা যায়? তারা ওখানে থাকবে, তারা সেখানে থাকুক তারা দেখবে কেমন করে ঘড়ির কাঁটা অন্য দিকে ঘুরে যায়।

অবশেষে বলব, আমি কাপুরুষ নই। জীবনে কখনো কাপুরুষতা করিনি। আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাকে কারাবরণ করতে হয়েছে। সব

সময় কঠিন সময় মোকাবিলা করে এসেছি। আমি আজ কাপুরুষতা করছি না। তবে নিরাপত্তা পরিষদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে প্রয়োজনের চেয়ে এক মহূর্ত বেশি অবস্থান করা আমার দেশও ব্যক্তি হিসেবে আমার জন্য অপমানজনক। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর আগ পর্যন্ত যা কিছু বেআইনি ছিল, তার সবটাই আমি বয়কট করছি না। আমি তাতে শরিক হতে চাই না। আমরা লড়াই করব, আমরা ফিরে যাব, লড়াই করব, আমার দেশ আমাকে ডাকছে, আমি এই নিরাপত্তা পরিষদে বসে কেন সময় নষ্ট করব? আমার দেশের এক অংশের কলঙ্কজনক আত্নসমর্পণে আমি শরিক হব না। আপনারা আপনাদের নিরাপত্তা পরিষদ নিয়ে থাকুন। আমি চললাম।”

১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্ন-সমর্পণ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ তখনো কোনো মতৈক্যে পৌঁছতে পারেনি। ভারত জানিয়ে দেয়, সে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করছে। একদিন পর ইয়াহিয়া খান জানালেন তিনিও যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত। এর চারদিন পর ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ অবশেষে কোনো প্রকার বাধা ছাড়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই প্রস্তাবে বলা হলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি স্থায়ী হতে হবে এবং ভারত ও পাকিস্তানকে নিজেদের সেনা যার যার সীমান্তের পেছনে ফিরিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ঘরে ঘরে পতাকা উড়ছে।

স্বীকৃতির পক্ষে বিপক্ষে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভারতের স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর মধ্যে এসে যায়। ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে "ভারত পাকিস্তান" যুদ্ধের পরিচিতি থেকে মুক্তি দিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের আগে স্বীকৃতি মিলেছিল ভারতের পর ভুটান থেকে। ভুটান ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, করেছে ভারত-বাংলাদেশে যৌথ বাহিনীর কাছে। যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিল পত্রে বিষদ বর্ণনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্টের সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী অবস্থান নিলেও যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। বাংলাদেশকে ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায় খুব দ্রুত। মার্কিন সিনেটও প্রতিনিধি পরিষদে সদস্যদের দেওয়া বক্তব্য ও তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশের জনগণ জানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, কিন্তু সেদেশের সিনেট প্রতিনিধি ও জনগণের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত এবং মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। ভারতের স্বীকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর ৬ ডিসেম্বর সিনেটের দেওয়া এক বক্তব্যে সিনেটের রবার্ট বায়ার্ড (পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য) বলেন, বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় স্বীকৃতি যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন জোগাবে। তিনি বলেন, "আজ সকালের রেডিও খবরে জানতে পারলাম যে পূর্ব-পাকিস্তানকে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদ্যোগ নিশ্চিত ভাবেই পাকিস্তানকে যুদ্ধ করবে তা যুদ্ধে তেল ঢেলে দেবে।"

ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য হেনরি হেলসটস্কি (নিউজার্সি থেকে নির্বাচিত) ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ৯ ডিসেম্বরে দেওয়া বক্তব্য তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করা। প্রতিনিধি পরিষদে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, জনাব স্পীকার, আজ আমি একটি সাধারণ হাউজে প্রস্তাব উত্থাপন করছি, তা হলো বাংলাদেশকে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণ কূটতৈনিক স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত।

হেনরি হেলটস্কি বলেন "ওই অঞ্চলের বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে আওয়ামীলীগকে

গ্রহণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণকে ঘৃণ্যভাবে দমনের দায়ে পাকিস্তান সরকারকে দায় স্বীকার করতে বলা উচিত। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান যে ঘটনা ঘটান, তা সেখানে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাকিস্তানের শত্রুতা পূর্ণ সম্পর্ক অখন্ড পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছে। জনাব স্পিকার বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে, এটা কেবল সময়ের ব্যাপার। আজ সকালে ওই অঞ্চল থেকে আসা প্রতিবেদন এটাই জানান দিচ্ছে যে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে এবং প্রায় পরাস্ত করে ফেলেছে। এই বাহিনীর হাতে খুব শিগগির বিজয় অর্জন না করার কোনো কারণ দেখছি না। "যুক্তরাষ্ট্র যদি শুধু বাস্তবতায় নিরিখেই কোনো পদক্ষেপ নেয় তা হলে এক্ষেত্রে এই উত্তরণের বিষয়টি তাদের মাথায় নিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে গোড়ামি আছে। তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ইয়াহিয়া খানের দমনমূলক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে মুখোমুখি হতে হবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রকৃত ঘটনাবলির।

বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির পর ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান দলীয় সদস্য পল এন ম্যাকস্লসকি (ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত) এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, "নতুন জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, গত বছর অনুষ্ঠিত মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনে বিজয়ী ১৬৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে সরকার চালানোর জন্য যথা সংখ্যক প্রতিনিধি বেঁচে আছেন কিনা তারা যদি বেঁচে থাকেন তবে ঔপনিবেশিক বিরোধী ঐতিহ্য বজায় রেখে আমাদের উচিত বাংলাদেশকে একটি নতুন জাতির স্বীকৃতি দেওয়া।

ভারতের আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির সূচনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রীরা গান্ধী

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গণহত্যা এবং ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার গঠনের পর এই সরকারের নেতৃত্বেই কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে পরিচালিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় থেকে পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন সবকিছু থাকলেও কখনো আইনগত ভাবে স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ নামের কোনো রাষ্ট্র। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবেই দেখার মতো। ভারতের সেনাবাহিনী কোন ভূখন্ডে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে পাকিস্তানের না বাংলাদেশের। ৩ ডিসেম্বর যখন সরাসরি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন পরিস্থিতি পাল্টাল দ্রুতই। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরুর পর দিনই ৪ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর কাছে চিঠি লেখলেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ।

চিঠিটির সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার দেশের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সরাসরি আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে জানতে চাই যে, বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী, যেকোনো সেক্টর ফ্রন্টে বাংলাদেশের পাকিস্তানের আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত রয়েছে। আমরা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারি তবে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অবস্থান আরও জোরদার করা সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আমরা আবারো আমাদের দেশ ও সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতির জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের এই অনুরোধের প্রতি ইন্দিরাগান্ধী সাড়া দিলেন। ভারতের পার্লামেন্টে একাত্তরের ৬ ডিসেম্বর দেওয়া বিবৃতির পর ইন্দিরাগান্ধী সেই দিনই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে লেখা চিঠিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা জানিয়ে দেন। চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা, বাংলায় নিম্নরূপ: **নয়াদিল্লি, ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১ যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্রে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।**

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,
৪ ডিসেম্বর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আপনি যে বার্তা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে আমিও ভারত সরকারের আমার সহকর্মীবৃন্দ গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছি। বার্তাটি পেয়ে ভারত সরকার আপনার নিবেদিত প্রাণ ও নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য আপনার অনুরোধ পুনর্বিবেচনা করছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ভারত সরকার স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ সকালে এবিষয়ে পার্লামেন্টে আমি একটি বিবৃতি প্রদান করেছি।

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো, বাংলাদেশের জনগণকে প্রচুর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আপনাদের যুব সম্প্রদায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য এক আত্মোৎসর্গীকৃত সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। ভারতের জন-সাধারণও অভিন্ন মূল্যবোধের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করেছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সহমর্মিতা প্রচেষ্টা ও ত্যাগ দুই দেশের মৈত্রীক আরও সুদৃঢ় করবে। পথ যতই দীর্ঘ হোক না কেন ভবিষ্যতে দুই দেশের জনগণকে যত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে বলা হোক না কেন আমি নিশ্চিত যে জয় আমাদের হবেই। এই সুযোগে আপনাকে আপনার সহকর্মীগণকে এবং বাংলাদেশের বীর জনগণকে আমার প্রীতি সম্ভাষন ও শুভ কামনা জ্ঞাপন করছি। আমি এই সুযোগে আপনার মাধ্যমে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রতি আমার সর্বোত্তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

(ইন্দিরা গান্ধী)

ভারতের পর ভুটানের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ৮ ডিসেম্বর এই দুই দেশের প্রথম স্বীকৃতি একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে “ভারত-পাকিস্তান” যুদ্ধের পরিচিতি থেকে মুক্তি দিয়েছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কমান্ডারের নিকট।

বুদ্ধিজীবী হত্যা
১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তার দূসর রাজাকার, আল-বদর বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এভাবেই ফেলে রেখেছিল বধ্যভূমিতে।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতকে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধে জড়িয়েছিল পাকিস্তান অতঃপর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর শেষ আঘাত। ২৫ শে মার্চের রাত্রের গণহত্যা এবং পরবর্তী ৯মাস রাজাকারদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় এবং বাড়িতে লোকজনকে ধরে এনে এক সাথে গুলি করে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে জীবিত অবস্থায় গণ-কবর দিয়ে ফেলতো, বাঙ্গালীদের এই গনহত্যার মধ্যেও নিশানায় ছিল বুদ্ধিজিবী লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক শিক্ষকও সরকারি কর্মচারি। ১৪ ডিসেম্বর সারাদেশে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করে এই দেশের দোসর, রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদাররা। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও গণহত্যার ১৪ ডিসেম্বর কালো দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর আত্মসর্ম্পণের আগ মহূর্তের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিশ্বগণমাধ্যমকে সাড়া জাগায়, দেশবাসী এবং বিশ্ববাসী জানতে পারে বাঙ্গালী জাতির গণহত্যার মধ্যেই চলছিল পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড। আত্মসর্ম্পণের আগে দ্য সানডে টাইমসের ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এর অনুবাদ: ঢাকায় বৃহস্পতিবার আত্মসর্ম্পনের আগে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী শহরের বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করছে এবং তাদের মধ্যে পঞ্চাশেরও বেশি লেখক গুলি করে হত্যা করেছে। আকস্মিক সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে নিবিড় পরিকল্পনার আওতায় বাঙ্গালী এলিট নিধনের অংশ হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এটা অবশ্যই কমান্ডিং অফিসার জেনারেল নিয়াজিসহ পাকিস্তান হাইকমান্ডের পূর্ণ জ্ঞাতসারে ঘটেছে। এসব মৃতদের আবিস্কার ঢাকা শহরে উত্তেজনা বাড়াতে পারে। পাল্টা হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গার জন্য

দিতে পারে। এমনকি মুক্তি বাহিনীর গেরিলা ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর মধ্যেও সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে। ঢাকার মূল শহরের পাশে রায়ের বাজারে কতগুলো বিচ্ছিন্ন গর্তে নিহত বুদ্ধিজীবিদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় আমি নিজে ৩৫টি গলিত দেহ দেখেছি। আপতত দৃষ্টিতে মনে হয় তাঁরা চার পাঁচদিন আগে নিহত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরো বেশি হবে। ঢাকায় অপহরন করা এধরনের লোকের সংখ্যা অন্তত ১৫০ হতে পারে।

ইউপিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত ব্যাক্তিদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রধান হৃদরোগ চিকিৎসক ফজলে রাব্বী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মুনীর চৌধুরী রয়েছেন। ঢাকার মধ্যবিত্ত এলাকা ধানমন্ডির বাইরে একটি ইটখোলাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। যদিও কচুরিপানার নীল সাদা ফুল কর্দমাক্ত জলাশয়ে শোভা পাচ্ছে। স্থানটি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ ঢাকার শত শত মানুষ মাটির বাঁধ দিয়ে হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছে। তাদের অনেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট স্বজনদের।

বিশিষ্ট জনদের ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালেই। পাঞ্জাবি সেনাদের কয়েকটি স্কয়াড নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হয়ে নির্ধারিত পুরুষ ও নারীকে সশস্ত্র প্রহরায় উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। তাঁদের সম্ভবত রায়ের বাজার ইট খোলায় এনে মাটির বাঁধের পাশে লাইন ধরে দাড় করিয়ে গুলি করেছে। যাতে তারা হুমড়ি খেয়ে নিচের জলাশয়ে পড়ে যান।

ড. আমিনুদ্দিন বেঙ্গল রিসার্স ল্যাবরেটরির প্রধান, অক্সফোর্ডের পিএইচডি। পাকিস্তানি সেনারা যখন তাঁকে তুলে নেয়, সেই মঙ্গল বার ৭টায় তাঁকে শেষ বারের মতো দেখা যায়। নাজিউর রহমান বললেন, "আমি দুঃখিত, আমাকেও যেতে হচ্ছে, খুঁজে দেখি।" ততক্ষনে তিনিও উলের মাফলার দিয়ে নাক-মুখ পেঁচিয়ে নিয়েছেন। গতকাল আমি কেবল তিন ঘণ্টা ঢাকায় ছিলাম, ততক্ষণে ইট ভাটার এই খবর তেমন ছড়ায়নি। জনতা উত্তেজিত, তবে আচরণে অদ্ভুত কোমলতা, ভারতীয় সেনাদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। গাড়িতে এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। সেদিনও অনেক গোলাগুলি হয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় হোটেল ইন্ট্যার কান্টি-নেন্টাল হোটেলে (বর্তমান হোটেল শেরাটন বা রূপসি বাংলা) অবস্থানরত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। পরিস্থিতি তখনো বিস্ফোরনোম্মুখ। বাঙ্গালিরা অভিযোগ করছে। বিহারি এই বিদেশিরা বহু বছর আগে মুসলমান হিসেবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

তারা বাঙ্গালি হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছে। আট মাস আগে আমি যখন যশোর ছিলাম। একারনেই সেখানে বেসামরিক বিহারিদের হত্যা করা হয়। ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড যশোরের হত্যাকান্ডের চেয়ে শতগুন বেশি ভয়াবহ একটি ব্যাপার। কাজেই এক ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রহরায় সেনা নিবাসে বন্দী পাকিস্তান সেনারা এখনো সশস্ত্র। যদি প্রয়োজন পড়ে ঢাকা যখন পাকিস্তানি সেনারা কত পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড চালিয়েছে, তখন দেখা দেবে সত্যি কারের সংকট।

যাই ঘটুক, পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য সহানুভূতিপ্রবণ হওয়া বাঙ্গালীদের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। এ রকম একটি সুশৃঙ্খল সেনা বাহিনী এভাবে খেলা চলছে অপ্রয়োজনে উম্মত্তের মতো খুন করতে পারে তা অবিশ্বাস্য। যদি পাইকারি হত্যাকাণ্ডকে সংবাদপত্র গণহত্যা অখ্যায়িত করে তা অবশ্যই ভয়ংকর কিন্তু পরিকল্পিতভাবে বাছাই করে জাতির সবচেয়ে যোগ্য, বুদ্ধিমান ও গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ ও নারী হত্যার মাধ্যমে যদি জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেওয়া হয় এলিট হত্যা যে আরও বেশি ভয়ংকর। গত মঙ্গল বারের অনেক আগেই পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। যেসব কর্মকর্তা এই পরিকল্পনা করেছেন, তাঁরাও তা অবশ্যই জানেন। কাজেই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকেও ধবসিয়ে দেওয়া। বহুদিন ধরেই অনুমান করা হচ্ছিল, পাঞ্জাব মরুভূমির রুক্ষ সেনারা বাঙ্গালিদের প্রতি হিংস্র বর্ণবাদী ঘৃণা লালন করে আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে তারা বুদ্ধিভিত্তিক ঈর্ষাও লালন করছে। যার প্রকাশ ঘটেছে এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার প্রায় ৪যুগ পরেই বাংলাদেশের মাটিতে শুরু হয়েছে আওয়ামীলীগ সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের ২/৩ বৎসর পর ১৯৭৩ সালের একটি পূর্ণাঙ্গ আইনকে আরো যুগোপযোগী করে আপীলের ব্যবস্থা রেখে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন পাস করে। ট্রাইব্যুনাল প্রমাণ করলো ১৯৭১ সালের সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের ধরন এতই ব্যাপক এবং ভয়াবহ এর বিচারের দাবি কখনো তামাদি হয় না। ১৯৭৩ সালের আইন (ধারা-৩) এবং ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (ধারা-২) মতে, জেনোসাইডের লক্ষ হতে হবে সুনির্দিষ্ট ৫টি গ্রুপের

সদস্যদের পূর্নাঙ্গ বা আংশিক নিধন। এই গ্রুপগুলো হচ্ছে জাতীয় ও জাতিগত বর্ণ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এই গ্রুপ ভিত্তিতে বিচার করবে। অন্য কোনো পেশার সদস্যদের হত্যা জেনোসাইড হিসাবে বিবেচিত হবে না। তবে পেশা না হলেও জাতীয় ও জাতিগত ভিত্তিতে, অর্থ্যাৎ বাঙ্গালী হওয়ার কারণে নিধন জেনোসাইড বলে বিবেচিত হবে। ১৯৭১ সালে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিধন নিশ্চিত ভাবেই জেনোসাইড। কারণ কেবল ধর্মীয় কারণে তাদের হত্যা করা হয়। একই সঙ্গে এসব হত্যাকাণ্ড মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলেও বিবেচনা করা যায়। ট্রাইব্যুনালের তদন্তকারীদের প্রথম প্রচেষ্টা হচ্ছে, ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য, ভিকটিমদের গ্রুপ ভিত্তিক পরিচয়, সাক্ষী, আলামত, কাগজপত্রাদি অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা, যার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করা যাবে যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে জেনোসাইড সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই অপরাধে তদন্তাধীন সন্দেহ ভাজনদের ভূমিকা এক ছিল অপরাধের সহযোগীরাও এই আইনের আওতায় আসবে। জেনোসাইড ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণে ক্ষতিগ্রস্থরা আজো বেঁচে আছে, তারা দেখে যেতে চায় এর বিচার। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল দল তাদের তদন্ত কাজ শেষ করে অভিযুক্ত কয়েকজনের নাম ট্রাইব্যুনালে দাখিল করার পর তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় আনার জন্য বন্দী করা হয় এবং তাদের বিচার চলছে।

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে ২৬ মার্চ গোলাম আযমসহ অন্যান্য রাজাকারদের বিরুদ্ধে গণরায় লক্ষাধিক জনতার সামনে রায় ঘোষণা করে। এই রায় কার্যকর করার জন্য সরকার ও আদালতের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার জাহানারা ইমামসহ অনান্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহী মামলা করে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়। জাতি ঘৃণাভরে লক্ষ করছে এই বিচারের কাজ বাধাগ্রস্ত করার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। তারা বুঝতে পারবে '৭১-এর মানবতা বিরুধী অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নামের সাথে তাদের নামও জড়িয়ে গেছে। ইতিহাস কাহাকেও কোন দিন ক্ষমা করেনি। এরই মধ্যে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ের জামায়েত ইসলামীর সাবেক সদস্য আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। জনাকীর্ণ বিচার কক্ষে আন্তার্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি ওরায়দুল হাসান ২১ জানুয়ারি ২০১৩ রোজ সোমবার বহু আলোচিত ও প্রতীক্ষিত এ রায় ঘোষণা করেন ১১২পৃষ্ঠার এ রায়ে একাত্তরের হত্যা ধর্ষণ লুট, অপহরন ও নির্যাতনের

অভিযোগ সন্দেহহীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় সর্বোচ্চ এ সাজা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংগটিত মানবতা বিরোধী অপরাধ বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথম এই রায় দেওয়া হয়। এই রায়ের পর জামায়াত বেসামাল হয়ে উঠে। তারা পুলিশের ওপর চোরাগুপ্তা হামলায় শুরু করে। কিন্তু বাচ্চু রাজাকার বিচারের আগেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় তার অনুপস্থিতিতেই বিচার কাজ সম্পন্ন হয়।

এরপর একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়েত ইসলামীর সহ-সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লাকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে যাবজ্জীবন আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ বিচার কক্ষে ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বহুল আলোচিত ও প্রতীক্ষিত এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। ১৩২ পৃষ্ঠার রায়ের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে ৩৫ পৃষ্ঠা পাঠ করেন ট্রাইব্রুনাল। একাত্তরে গণহত্যায় হত্যা, ধর্ষণের অপরাধে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ দন্ড দেওয়া হয়। বিচারে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনা ছয়টির মধ্যে পাঁচটি অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধ বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এটি দ্বিতীয় রায়। তবে এ রায় সাধারণ মানুষ মেনে নেয়নি এবং গর্জে উঠেছে বাংলাদেশের জনগণ কাদের মোল্লাসহ সব যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দাবিতে জেগে উঠা তারুণ্যের আহবানে উত্তাল জনসমুদ্রে রূপ নেয় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শাহবাগ গনজাগরণ মঞ্চে। এই অরাজনৈতিক মহা সমাবেশ মঞ্চে থেকে একাত্তরের খুনি ও ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত, স্বাধীনতা বিরোধী জামায়েত ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ জামায়েত শিবির নেতাকর্মীদের সর্বস্তরের বয়কটের অঙ্গীকার করেছে উত্তাল জনসমুদ্র একই সঙ্গে জামায়েত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গুলোকে বর্জনের শপথ নেয় লাখো মানুষ।

গণজাগরন মঞ্চে নতুন প্রজন্মের অগ্নি শপথ

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায় গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়ে শেষ হয়েছে শাহবাগের মহাসমাবেশ। কিন্তু জনগণ প্রসিকিউশনের আপিল করার দাবি আদায় করে। যাদের শ্লোগানে যোদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল শাহবাগ, তাদের একজন লাকী আকতার, এদের মধ্যে আরো অগ্নিকন্যা সারাক্ষণ স্লোগান দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিলো। শুধু আমাদের দেশ নয় সারা পৃথিবীতে যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে। এরই ধারাবাহিতায় কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করা হলো কিন্তু

আমাদের দেশে ২০১০ সালে ২৫ মার্চ বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর আমাদের দেশের এক শ্রেণির রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিস্বার্থে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিতে থাকে। আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যেও ট্রাইব্যুনাল একের পর এক রায় দিতে সমর্থ হচ্ছে। আরো মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং রায়ের অপেক্ষায় আছে। এই ট্রাইব্যুনালকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে এর স্থায়িত্ব অপরিহার্য যেন অন্য কোন অপশক্তি এই ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে। এরই মধ্যে ১২/১২/১২ তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার রাত্র ১০টা ১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়েছে এবং ফরিদপুর জেলায় নিজ গ্রামে তাকে দাফন করা হয়। শাহ্‌জাহান ভূঞার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের জল্লাদের একটি দল ফাঁসি কার্যকর করেন।

আইএমটি ন্যুরেম বাগ :

ন্যুরেমবাগ বিচার ছিল সামরিক ট্রাইব্যুনালের ধারাবাহিকতা এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সহায়ক বাহিনী দিয়ে গঠিত আর এতে বিচারের সম্মখীন করা হয়েছিল নাৎসী রাজনৈতিক সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বে থাকা বিশিষ্ট সদস্যদের। এটি ছিল ইন্ট্যারন্যশনাল মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল (আইএমটি) ১৯৪০-৪৬ সালে অনুষ্ঠিত ওই বিচার হয়েছিল জার্মানির বেভারিয়ার শহরের ন্যুরেম বাগ। “প্যালেস অব জাস্টিস”-এ এটিকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ট্রায়াল বলে অভিহিত করা হয়। যার প্রধান ছিলেন ব্রিটিশ বিচারক নরম্যান বারকেন। ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ট্রাইব্যুনাল। রাজনৈতিক ও সামরিক ২৩ নেতার বিচার সম্পন্ন করা হয়। অন্যতম আসামি মার্টিন বোরম্যান, এর অনুপস্থিতিতেই তার বিচার হয়।

অপর অভিযুক্ত রবার্ট লে, বিচার শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আত্নহত্যা করেন। অন্য দিকে এ্যাডলফ হিটলার, হেনরিক হিমলার ও জোসেফ গোয়েবলস আত্ন-হননের পথ বেছে নেয়, অভিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস আগেই। ১৪ জানুয়ারি ১৯৪২ সনে নয়টি দেশের প্রতিনিধিরা জার্মান যুদ্ধাপরাধের ওপর আন্ত-সহায়ক রেজ্যুলিশনের খসড়া তৈরিতে লন্ডনে মিলিত হন। যুদ্ধকালীন তিন ক্ষমতাশালী দেশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সামরিক দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সম্মত হয়। বিচারের জন্য লন্ডনের চার্টার আইনগত ভিত্তি যা ১৯৪৫ সালে ৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০ জার্মানকে অভিযুক্ত করে ন্যরেম বার্গ ট্রাইব্যুনাল বিচারের আওতায় আনা হয়। আন্তর্জাতিক

আইন ও যুদ্ধ আইন লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্তদের বিচার হয়। চারটি দেশ থেকে বিচারক ও তাদের বিকল্প এবং চিফ প্রসিকিউটর নির্বাচন করা হয়। বিচারক ছিলেন মোট সাত জন আর চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন চার জন। প্রথম সেশন ২০ অক্টোবর ১৯৪৫ ন্যরেম বার্গের প্যালেস অব জাস্টিসে ইন্টারন্যশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এবং সোভিয়েত বিচারক নিকিচেনকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ আনা হয় নাৎসি বাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ২৪ মেজর ও সাত সংগঠনের বিরুদ্ধে এদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

অভিযোগগুলোর (১) সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংঘটনের পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ (২) শান্তির বিরুদ্ধে পরিকল্পনার উদ্যেগ আগ্রাসন এবং অন্যান্য অপরাধ (৩) যুদ্ধপরাধ (৪) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

বসনিয়ান জেনোসাইড:- বসনিয়া ও হারজে গোভিনা ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশে বলকান উপদ্বীপে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। ১৯৯২ সালের মার্চে বসনিয়া স্বাধীনের পরপরই এখানে মুসলমান ক্রোয়শীয় ও স্বাধীন জাতির মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধে, বসনিয়ার যুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সবচেয়ে নৃশংস যুদ্ধ ১৯৯২-১৯৯৩ সালের একতরফা যুদ্ধে প্রায় ২৬,০০০ হাজার মুসলিম নিহত হয় সরকারী হিসাব অনুযায়ী। কমিউনিস্ট শাসিত সাবেক যুগোস্লোভিয়া ভেঙ্গে স্বাধীন হওয়ার দুই বৎসরের মাথায় এই যুদ্ধ শুরু হয়। এযুদ্ধে সার্বওক্রোয়েট বাহিনী চরম বর্বরতার পরিচয় দেয়।

সার্বিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্লোকোদান মিলো সোচিভ এবং বসনিয়ার সার্ব নেতা রাদোভাবা কারা দিচ লাখো মানুষ হত্যা করে ইতিহাসে ঘৃণিত হয়ে আছেন। মিলোসোচিভ মারা গেলেও বিচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি কারা দিচ। ২০০১ সালে আর্ন্তজাতিক যুদ্ধপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। ১৯৯৫ সালে জুলাই মাসে ৮ হাজারেরও বেশি যুবককে হত্যা করে সার্ব বাহিনী। সেব্রেনিৎসার বধ্যভূমির করুন চিত্র এখনো মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী এক লাখেরও বেশি সাধারণ মানুষকে হত্যা করে বসনিয়ার সার্ব বাহিনী। গণহত্যার পাশা পাশি সার্ববাহিনী হাজার হাজার বসনিয়ার নারীকে ধর্ষন করে। ১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে ক্রোয়েটবাহিনী বসনিয়ার আমিচি নামে একটি গ্রামে বর্বোরোচিত হামলা চালিয়ে ১১৬ জন মসুলমানকে হত্যা করে। অন্য দিকে কোনো রকম হাতিয়ার ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বসনিয়ার, বসনিয়া বাহিনী প্রতিরোধের চেষ্টা করেও রেহাই পায়নি। দখলদার

বাহিনীর ওপর ন্যাটোর বিমান হামলায় পিছু হটাতে বাধ্য হয় দখলদার বাহিনী সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান বসনিয়ার কুখ্যাত সার্বনেতা রাদোভান কারাদিচ।

যুগোস্লাভিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯২ সালে সাবেক যুগোস্লভিয়ার যুদ্ধাপরাধের বিচারে বিশেষ কমিশন গঠন করা হয়। ওই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯৩ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ২৫মে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ফর দ্যা ফর মার যুগোস্লাভিয়া (আইসিটিওয়াই) গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সরাসরি জাতি সংঘের মাধ্যমে এই ধরনের ট্রাইব্যুনাল গঠন এটিই প্রথম, ১১ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে যাত্রা শুরু করে। বসনিয়ার সার্বনেতা ও সামরিক কমান্ডারদেরকে এ আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলো সেভিচের বিরুদ্ধে তার শাসনামলে মুসলমানদের ওপর চালানো গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্জাতনের দায়ে ২০০১ সালের ৩ জুলাই অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ২০০২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মূল বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। এই ট্রাইব্যুনালের অধীনে এ পর্যন্ত ১৬১ জন পলাতককে গ্রেপ্তারের পর বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। জাতিসংঘ ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করার জন্য ট্রাইব্যুনালকে তাগিদ দিয়েছে। এই আদালতে সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রুয়ান্ডা ট্রায়াল :

রুয়ান্ডার জেনোসাইড ও ঘটে যাওয়া আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকে কেন্দ্র করে ১৯৯৪ সালের লভেম্বরে জাতি সংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল গড়ে তোলে আর্ন্তজাতিক আদালত। এর নাম দেয়া হয় ইন্ট্যারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডা (আইসি টি আর)। দেশটির পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চলে। ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার এখনো বর্তমান। জেনোসাইড, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে বিচার করা এ ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব। এই ট্রাইব্যুনাল ৫০টি অপরাধের বিচার করেছে সাজা হয়েছে ২৯ ব্যাক্তির।

প্রথমটি শুরু হয় ১৯৯৭ সালে জিন প্রল আকায়েসুর বিচারের মধ্য দিয়ে অপরাধের অভিযুক্ত হন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী জিন কামবান্ডদা।

ধর্ষণ :

জিন পল আকায়েসুর বিচার প্রতিষ্ঠা করে ধর্ষণ জেনোসাইড়ের অপরাধ। বিচারে

বেরিয়ে আসে টাবায় তুতসি নারীদের ধর্ষণ করা হয়। এরপর হত্যা করা হয় তাদের। ট্রাইব্যুনালে গঠন পূর্বক চার চেম্বারে ১৬ বিচারকের মাধ্যমে গঠন করা হয় ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যে তিনটি বিচার করার জন্য, আর একটি আপিল শোনার জন্য, এর বাইরে আরো নয়জন "অ্যাডলিটেন" বিচারক। সব মিলিয়ে ২৫ জন, প্রসিকিউটরের অফিস দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথমটি তদন্ত বিভাগ, তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে তদন্ত করে প্রসিকিউটর অফিসে জমা দেয়া। দ্বিতীয়টি প্রসিকিউশন সেকশন, তাদের দায়িত্ব তদন্ত প্রতিবেদন সঠিকভাবে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা।

বাংলাদেশ :

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ শুরু হয় ২০১০সালের ২৫ মার্চ, বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। একই দিন গোলাম আরিফ টিপুকে চিফ প্রসিকিউটর হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তার নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে প্রসিকিউশন টিম, ওই দিন তদন্ত সংস্থা ও গঠন করা হয়। বর্তমানে তদন্ত সংস্থার সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান খান, ২০১২ সালের ২২ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয়। এই ট্রাইব্যুনাল যাত্রা শুরু করেন ওই বছরের ২৫ মার্চ। চেয়ারম্যান হন ট্রাইব্যুনাল-১ এর দ্বিতীয় জেষ্ঠ্য বিচারপতি এটিএম ফজলে কবীর, ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক ২০১২ এর ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। এরই মধ্যে এই ট্রাইব্যুনাল গোলাম আযম, সাইদী, কাদের মোল্লা, সাকা চৌধুরীসহ কয়েক জন এর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন ও ফাঁসির আদেশসহ রায় প্রদান করেছেন।

উল্লেখ্য এই ট্রাইব্যুনালকে সংবিধানের মাধ্যমে আইনে পরিণত কারা হলে কোন সরকার এর বিরোধীতা করতে পারবে না। ১৯৭৫ পরবর্তী যে সকল রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় তার বেশীর ভাগ স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি। এরা বিভিন্নভাবে জাতিকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। আরো উল্লেখ্য ৫ ফেব্রুয়ারি কাদের মোল্লার মৃত্যুদন্ডের আদেশ না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড জনগণ মেনে নিতে পারেনি। এই দেশের নতুন প্রজন্ম শাহ্‌বাগ এলাকায় এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সারা জাতি '৭১ এর চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন। দেশ চলবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। সকল প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন চালাতে না পারে ৬টি দাবি নিয়ে মাননীয় স্পীকারের নিকট দাবি পেশ করে। মাননীয় সংসদ নেতা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এদাবির পক্ষে একাত্বতা

ঘোষণা করেন এবং সকল সংসদ সদস্য হাত চাপড়িয়ে এর সমর্থন জানান এবং আইনমন্ত্রী দুপক্ষের আপিলের সুযোগ রেখে ১৯৭৩ সালের ২১ ধারার সংশোধনী আনেন, কারণ ২১ ধারায় সরকারের আপিলের সুযোগ ছিলনা। সংশোধনীতে যে কোনো রায়ের বিরুদ্ধে সরকার বা প্রসিকিউশনের আপিলের বিধান যোগ করা হয়। অনেকে বিভ্রান্ত ছড়ায় ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, আসলে তখন পরিস্থিতি ছিল, শত শত বাঙালী পাকিস্তানে আটকে আছে। তাদের জীবন রক্ষার্থে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বন্দি বিনিময় করে আটকে পড়া বাঙালীদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনে। পাকিস্তান আশ্বাস দিয়েছিল তারা যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। দেশীয় রাজাকারদের বিচার সম্পন্ন হলে, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। শাহাবাগ চত্বরে আবার মুক্তি যুদ্ধের স্লোগান নতুন প্রজন্মের মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো "জয় বাংলা।" "তোমার আমার ঠিকানা "পদ্মা মেঘনা যমুনা।" "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" "তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।"

এই স্লোগান জাতিকে একত্রিত করে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৫ পরবর্তী দীর্ঘ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী চক্র দেশের শাসন ভার গ্রহণ করে। নতুন প্রজন্ম ভুলতে বসেছে দেশ প্রেম, সারা দেশে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শাহ্‌বাগ থেকে স্মরন করে দিল আমরা ভুলিনি মুক্তি যুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলো, ভুলিনি রাজাকার, আল-বদর আল-সামস্ ও পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত ৩০ লক্ষ শহীদের কথা, ভুলিনি ২ লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জত্বের কথা। বাঙালী জাতি আবার জেগেছে, পাকিস্তানি ভাবধারা ধুয়ে মুছে যাক, নিপাত যাক যত দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী চক্র।

বিজয়ের দিন
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটতে যাচ্ছিল। বাঙালী জাতির ২৬৬ দিন কেটেছে এই দিনটির প্রতীক্ষায়। এই দিন সকাল ৯ঘটিকার সময় যৌথ বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল একে নিয়াজির একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পৌঁছায়। তিনি তাতে আগের দিন থেকে ঢাকায় বোমা বর্ষণ স্থগিত রাখার সময়সীমা বিকেল তিনটা পর্যন্ত বাড়াতে অনুরোধ করেন। চূড়ান্ত করতে বলেন যুদ্ধবিরতির শর্তগুলো, কার্যত ডিসেম্বরের শুরু থেকে মুক্তি বাহিনীর ও মিত্র বাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী ততদিনে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলার নিয়ন্ত্রন তখন আর তাদের হাতে ছিল না। ঢাকাতেও চলছে গেরিলাদের চোরাগুপ্তা হামলা। ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যানেকশা সকাল সোয়া নয়টায় ফোন করেন মেজর জেনারেল জেএফআর জ্যাকবকে। জ্যাকব ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের অপর শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তা। জ্যাকবের কাছে নির্দেশ এল দ্রুত ঢাকায় গিয়ে সেদিনই পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সব ব্যবস্থা করে ফেলতে।

১৪ ডিসেম্বর থেকে শুধু নিয়াজি নন, পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তারাও কার্যত পরাজয় মেনে নিতে শুরু করেছিলেন। এইদিন বেলা দেড়টায় ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এম মালিক ও নিয়াজিকে একটি বার্তা পাঠান:- এখন আপনারা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে আর লড়াই করা সম্বব নয়। লড়াই করে কোনো ফায়দাও নেই। এতে শুধু আরো মানুষের প্রাণ যাবে, আর ক্ষয় ক্ষতি বাড়বে। এখন যুদ্ধ থামাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো সেনা ও বিশ্বস্থ সহযোগীদের প্রাণ বাঁচাতে যা যা করা দরকার, সব আপনি করুন।

বার্তাটি পেয়ে নিয়াজিও বসে থাকেননি। মানেকশকে পাঠানোর জন্য একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব লেখা হলো। কিন্তু ভারতীয় বিমান হামলায় বেতার যোগাযোগ

ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তাই নিয়াজি সেটি তুলে দিলেন ঢাকার মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাকের হাতে। মানেক শর কাছে এ প্রস্তাব পৌঁছে গেলেই যুদ্ধের অবসান ঘটত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষার একটি শেষ উপায় খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা চালায়। প্রাপকের কাছে সে বার্তা পৌঁছায় ২১ ঘণ্টা পরে। এই বিলম্ব বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের একটি বিরাট সময় এনে দেয়। মানেকশব বার্তা পেয়ে হেলিকপ্টারে ঢাকায় রওনা দেন জ্যাকব। তাঁর সাথে উর্ধ্বতন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন মুক্তি বাহিনীর উপ প্রধান উইং কমান্ডার একে খন্দকার, থাকার কথা ছিল মুক্তি বাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানীরও, কিন্তু তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে না পারায় তিনি চলে যান সিলেট মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে।

তাঁরা যখন তেজগাঁও বিমান বন্দরে এসে নামলেন সেখানে তখন লক্ষ জনতার ভিড়। ভেতরে অসংখ্য সাংবাদিক। জ্যাকবকে নিয়াজি তাঁর অফিসে স্বাগত জানান। সিদ্ধান্ত হয়, আত্মসমর্পন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে রেসকোর্স ময়দানে। জনগণের সামনে, প্রথমেই আরোরাকে দেওয়া হবে গার্ড অব অনার। এরপর দলিল দস্তখত পর্ব। সবশেষে নিয়াজি সমর্পণ করবেন তাঁর তরবারি, কিন্তু নিয়াজির তরবারি না থাকায় সিদ্ধান্ত হলো নিয়াজির একটি রিভলবার তুলে দেবেন প্রতীকী অর্থে।

বিজয়ের খবর পেয়ে ঢাকায় আসতে শুরু করলেন দলে দলে মুক্তিযোদ্ধারা। পথে পথে উল্লসিত জনতা মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে জড়িয়ে ধরছেন। উল্লাসে ফেটে পড়লেন দেশবাসী। যথারীতি রেসকোর্স (বর্তমান সওরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে গার্ড অব অনার হলো। অরোরা আর নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে দস্তখত করলেন। দস্তখতের জন্য অরোরা গাঢ় কালো কালির একটি শেফার কলম কিনে এনেছিলেন। কিন্তু নিয়াজি স্বাক্ষর করার সময় কালি বেরোলনা। কলমটি ঝাঁকি দিয়ে তারপর স্বাক্ষর করলেন। দলিলে সময় লেখা ছিল ১৬.৩১ ঘণ্টা (ভারতীয় সময়)। কিন্তু জ্যাকব লিখেছেন, তাঁর ঘড়িতে চারটা বেজে পঞ্চান্ন। কাঁধ থেকে অধিনায়কের ব্যাজ খুলে রাখলেন নিয়াজি ৩৮ রিভলবার তুলে দিলেন অরোরার হাতে। তাঁর চোখে অশ্রু।

আত্ম-সমর্পণ দলিলের অনুবাদঃ

পূর্ব রনাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশি যৌথ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানের সব সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হলো, পাকিস্তানের সব সশস্ত্রবাহিনী আত্মসমপর্ণে সম্মত হলো। পাকিস্তানের স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীসহ সব আধা সামরিক ও বেসাময়িক সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে এই আত্মসমর্পণ প্রযোজ্য হবে। এই বাহিনীগুলো যে যেখানে আছে, সেখানে থেকে সবচেয়ে নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কতৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ ও আত্মসমর্পণ করবে।

এই দলিল, স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীন হবে। নির্দেশ না মানলে তা আত্মসমর্পণের শর্তের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলির অর্থ অথবা ব্যাখ্যা নিয়ে কোন সংশয় দেখা দিলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশনের বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য মর্যদা ও সম্মান দেওয়ার পবিত্র প্রত্যয় ঘোষণা করছেন এবং আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সামরিক ও আধা সামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুবিধার অঙ্গীকার করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন বাহিনীগুলোর মাধ্যমে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যাক্তিদের সুরক্ষা দেওয়া হবে।

স্বাক্ষর-
(জগজিৎ সিং অরোরা)
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ
পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও
বাংলাদেশ যৌথবাহিনী
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ইং

স্বাক্ষর-
(আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি)
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
অফিসার সামরিক আইন প্রশাসক
জোন-বি
এবং অধিনায়ক পূর্বাঞ্চলীয়
কমান্ড (পাকিস্তান)
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ইং

শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে সরকার গঠন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার পর ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব প্রভিশনাল কনস্টিটিউশন অর্ডার এর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি পদ্ধতীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে এম,এন,এ,ও এম,পিদের নিয়ে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন করেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন। ১০ এপ্রিল গণপরিষদের বৈঠক বসে। ১১ এপ্রিল সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। এতে বুঝা যায় যে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র সংসদীয় পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

পাকিস্তান কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তনের মাত্র ২ (দুই) দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি সরকার পরিবর্তন করে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু রক্তাক্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত জাতীয় মূল্যবোধ চেতনা ও আকাক্ষা গুরুত্বসহকারে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করেন।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পর লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মবলি দান ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জ্বতের বিনিময়ে দুঃখ ভরাক্রান্ত ও বিধ্বস্ত বাংলাদেশের বেদনাদায়ক বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আবেগ আপ্লুত। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্র মোতাবেক পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশবাসীর রায় এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানের প্রথম সুযোগে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখিন হয়নি। তাছাড়া একটি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের অর্থনীতি ও পুনঃর্গঠনে এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করার স্বার্থে জাতি সংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য মুক্তগণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের সাহায্যও সমর্থন আদায়ের কূটকৌশল রচনায়, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জরুরি ছিল। শাষণতন্ত্রের মার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু নিশ্চেন্তে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর সরকারের সম্মুখে কতগুলো মৌলিক ও বিরাজমান জটিল পরিস্থিতির মধ্যে :-

(ক) বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান।

(খ) যুদ্ধবিদ্ধস্ত অর্থনীতি প্রায় এক কোটির ওপরে শরণার্থী উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মানুষের প্রত্যাবাসন, যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার এবং পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনা।

(গ) দ্রুত আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং সমাজবিরোধীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং উম্মুক্ত সীমান্তের সমস্যা।

খাদ্য সংকট নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুস্প্রাপ্যতা, মূল্যবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকট এর সঙ্গে যুক্তছিল পাকিস্তানের সৃষ্ট পুরনো সংকট, প্রচলিত ও বিধ্বস্ত কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা। এই চিহ্নিত সমস্যাগুলো এত জটিল ছিল যে, এর যেকোন একটার কারণ বা জটিলতায় একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দেবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় জনপ্রিয়তা তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা বিশ্বাসে সংসদীয় কাঠামো সরকারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তিনি উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মিত্র ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে ভারতে ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা অত্যন্ত সার্থকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জনতার স্বতঃস্ফুর্ততায় পুনর্বাসন সমস্যার মত বিরাট চ্যালেঞ্জ সার্থকভাবেই মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু খাদ্য ও বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক সংকট এবং নিত্য প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়েই থাকলো এর সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুততা সংঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনজীবনকে বিপর্যস্থ করে তোলে। কিন্তু একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের কথা চিন্তা না করে অসচেতন জন সাধারণের এক বিরাট অংশই রাষ্ট্রের আদর্শিকনীতিমালা এবং তা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের সর্বপরি নীতি ও ফলাফলের অপেক্ষা না করেই অস্থির হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার পর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় উৎপাদন ব্যবস্থা ও কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল। অন্যদিকে হঠাৎ করে জ্বালানী তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়

তাতে যে হারে মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে তা ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য মারাত্মক ও আতঙ্কজনক। জাতীয় বিধ্বস্থ অর্থনীতির উপর এই ভয়ংকর আঘাত জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও অস্থিরতা ধুমায়িত হতে থাকে। সরকারকে ব্যাপক পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারি ও বেসরকারিখাতে বরাদ্ধ ছিল ব্যাপক। উচ্চমানের নোট অচল, ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর ব্যপারে বিধি নিষেধ এবং ব্যাংক ঋণ হ্রাসে মুদ্রাস্ফীতি রোধের ব্যবস্থাদি তাৎক্ষণিক জনজীবনে আর্থিক অবস্থার তেমন শুভ প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ স্বাধীনতার তিন বছরের শুরুতেই দেখা গেল দ্রব্যমূল্য তিন গুণ বেড়ে গেছে অথচ উৎপাদন ও জাতীয় আয় তেমন বাড়েনি।

তিন বছরের মধ্যে ১৯৭৩ সালের ভাল আমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্থ করতে পারেনি যে, খাদ্য নির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে যাচ্ছে। এই বাস্তব অবস্থায় ৭৩-৭৪ সালে ২২ লাখ টন খাদ্য আমদানি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ক্রমবর্ধমান মজুতদারী ফটকাবাজী ও আমাদানি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এবং ১৯৭৪ সালে জুন-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বন্যা পরিস্থিতি খাদ্য সংকটকে আরো ত্বরান্বিত করে তোলে।

আগস্ট মাস থেকে ধান চালের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধু খাদ্য সংকট থেকে পরিত্রানের লক্ষে ১৯৭৪ সালে সাহায্য দাতা দেশ ও বহিশক্তির নিকট হতে ত্বরিৎ সক্রিয় সাহায্য প্রাপ্তির আশায়, সরাকারের নীতিকে ব্যক্তিগত খাতে ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছুটা ছাড়াও সুবিধা প্রদান করেন। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের টাকায় ক্রীত খাদ্য পাঠাতে অহেতুক বিলম্ব করে এবং দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক চক্রান্ত ও আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীনতার কারণে ১৯৭৪ সালে ক্ষুধা দারিদ্রে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই রূপ প্রতারণামূলক আচারণে বঙ্গবন্ধু হতাশ হলেন। ১৯৭৪ সালে শেষের দিকে বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে শীতল অভ্যর্থনা পান। তিনি অনুধাবন করতে পারলেন মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার শক্তিকে উপেক্ষা করার ফলাফল কী হতে পারে।

বাংলাদেশের এক শ্রেণির নেতৃবৃন্দের সমাজতন্ত্র কায়েমের চাপ এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ চাপ ও অসৌজন্যমূলক এই আচরণের চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির

মাধ্যমে একক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এক আমূল ও বৈপ্লবিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের কর্মসসূচি বাস্তবায়নের এগিয়ে গেলেন। যার লক্ষ স্বনির্ভরতা অর্জন, আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। বঙ্গবন্ধুর সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত একক জাতীয় দল বাকশালের উত্তরণের পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়, আমলাতন্ত্রমুক্ত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণ, জন্ম নিয়ন্ত্রন, শাসন ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার মতো কর্মসূচি এবং সর্বোপরি শোষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় ঘোষণা ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মোক্ষম জবাব।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা নয়া পরিবেশে সাহায্যদাতা দেশগুলো ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি, বিদ্যমান সংকট ও দ্বন্দ্বগুলো সমাধানকল্পে পুঁজিবাদী পথ অন্বেষণ শুরু করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুর জন সমর্থন নষ্ট করার সর্বগ্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য সংস্থা সমূহ চার মূলনীতি বিশিষ্ট সংসদীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এসব সমস্যার সমাধান অসম্ভব মনে করে। তারা নিল নকশা তৈরি করতে থাকে এবং সামরিক আমলাতান্ত্রিক শক্তির রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য শাসনতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং চক্রান্তকে পদ্ধতীগত কার্যকর করার চেষ্টা শুরু করে। কারণ সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে বিদেশি স্বার্থ সাহায্য ও বিনিয়োগ অধিকতর নিশ্চিত ও নিরাপদমূলক বলে প্রমাণিত। ফলে বাংলাদেশে ও পাকিস্তানি ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পথ তৈরির লক্ষ নির্নীত হয়।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই বিরাজমান এসব সমস্যার সমাধানের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা শুরু করেন। বাস্তব অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। ১৯৭১ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসা পর্যন্ত মুক্তি বাহিনীর প্রায় কোনো অংশই অস্ত্র সমর্পণ করেনি। বরং অস্ত্র হাতে নিজস্ব পরিধিতে একটি স্বশাসিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কৃর্তৃত্ব লাভে তারা উৎসাহিত হয়ে পড়ে। তখন ছিল অগোছালো পুলিশ বাহিনী অসংগঠিত রাইফেলস বা আধা-সামরিক বাহিনীর মতো আইন শৃঙ্খলা সংস্থার অভাব সারা দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে পাক-বাহিনীর ফেলে যাওয়া প্রচুর অস্ত্র আলবদর, আলশামস্, ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস, মুক্তিযোদ্ধা নামধারী ষোড়শ বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, মুজিব

বাহিনী এবং দেশের অভ্যান্তরে মুক্তি বাহিনীর শত শত সংগঠন, নেতৃত্ব, উপনেতৃত্ব, গ্রুপ এবং পেশাদারী দুস্কৃতিকারী প্রায় সকলের নিকট ছিল স্বয়ংক্রিয় আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র।

১৯৭২ সালে ২ জানুয়ারি প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান এবং মাওলানা ভাসানীকে সদস্য করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হলেও তার কার্যকারিতা স্বয়ংসম্পুর্ণ আকারে নিতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু ১৭ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের কথা পূর্ণব্যক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতা আগ্রহ ও মেধার ভিত্তিতে তাদেরকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেন এবং দশ দিনের মধ্যে সকল অস্ত্র স্থানীয় মহাকুমা প্রশাসকের নিকট সমর্পণের নির্দেশ প্রদান করেন। মুক্তি যোদ্ধাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা হচ্ছে এরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে অথবা মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণের পরস্পর শুধু মাত্র চাকুরির মধ্যেই সীমা বদ্ধ করা হচ্ছে এ ধারণা থেকে তারা অস্ত্র জমা দানে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠে। ফলে আশানুরূপ অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হয়নি, এর প্রেক্ষিতে ৩০ জানুয়ারিতে ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পনের অনুষ্ঠানে তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অস্ত্র জমা হয়নি।

এরই মধ্যে সরকার গোয়েন্দাসূত্রে পরিস্কার রিপোর্ট পেয়েছেন যে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিকভাবে অস্ত্র সংরক্ষণ করার ঘটনাবলি ব্যাপকভাবে ঘটতে শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু তখন ২৪ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হয়। স্বাধীনতার পর হতেই বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের জন্য মুজিব বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর একাংশ বঙ্গবন্ধুর উপরে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকায়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে মুজিব বাহিনীর অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ত্যাগীনেতা কর্মীদের অস্ত্র জমা না দেয়ার গোপন নির্দেশ প্রদান করা হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উৎসাহী সশস্ত্র তরুন যোদ্ধারা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বন্দুকের নলকে কাজে লাগানো মুসলিম বাংলার শ্লোগানে স্বাধীনতা বিরোধী সশস্ত্র এবং মুক্তি যোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য সমাজ বিরোধী কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলার ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান এক অসম্ভব জটিলতা বঙ্গবন্ধুর নিকট আবির্ভূত হল। পুলিশ ফাঁড়ি, বাজার লুট, গাড়ি হাইজ্যাক, ছিনতাই নারী অপহরণ, সশস্ত্র পেশী শক্তির প্রদর্শন ও সন্ত্রাস এর ফলে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা জাতিকে এক আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থার মধ্যে ঠেলে

দেয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এ অবস্থার মোকাবেলা প্রায় অসম্ভব বলে প্রমাণিত হতে লাগল।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ :

১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে ১৯টি ফাঁড়ি ও থানা লুট হয়। স্বাধীনতার প্রথম বছরে ১৭,৩৪১টি হাইজ্যাক, প্রথম দু বছরে ১০,২৮০টি ডাকাতি, স্বাধীনতার প্রথম ১৬ মাসে ২,০৩৫টি গুপ্তহত্যা সংঘটিত হয়। এসব হত্যা, লুট, হাইজ্যাক এর সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করা হলে মাওলানা ভাসানী ও চীনপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ গুলোর রাজনৈতিক মুখপত্রে কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গকৃত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এই বলে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয় যে, সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এইসব দমন পীড়ন করছে। একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে সশ্রস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করে সরকার উৎখাত সাধনের প্রকাশ্য হুমকি মোকাবেলায় সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যথেষ্ট ধৈর্যের সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াতে জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা ও নমনীয়তা অদ্যাবধি ব্যর্থতার নমুনা হিসেবে আলোচনা করে চলেছে, স্বাধীনতা বিরোধীচক্র ও তার দোসররা। জনগণের নিকট একটি ধারণার জন্ম বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের কিছু লোকের কারণে এসকল সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না।

চীনপন্থী গ্রুপগুলোর একটি অংশ রাজশাহীর আত্রাই এলাকাকে স্বাধীন মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করে সশস্ত্রভাবে উক্ত এলাকায় বিকল্প ও সমান্তরাল সরকার পরিচালনার চালেঞ্জ মোকাবিলা দমনের গৃহীত ব্যবস্তাদি সরকারি পক্ষ হতে হিংস্রতা পরিহারে নির্দেশ দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের রাজনৈতিক এইসব প্রতিপক্ষকে রাষ্ট্রদ্রোহীতায় বিচার করে ফাঁসি দেয়া হয়নি, শুধু মাত্র কারাগারে আটক করে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু আত্রাই এলাকা নয় কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকা, ঢাকা-নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ-মানিকগঞ্জ এলাকা, বরিশাল, সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এসব সশস্ত্র গ্রুপকে মোকাবেলা করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক কার্যব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বঙ্গবন্ধুকে চিন্তিত করে তোলে। মৌলিক অধিকারের সুযোগে বিচার বিভাগ ঢালাওভাবে এসব রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিপক্ষে গুরুতর কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দিত। আইনের শাসনের প্রচলিত বিধি বিধান সমাজ বিরোধী ও সশস্ত্র গ্রুপের প্রোটেকশন হয়ে দাঁড়ায়।

জাসদ ও পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির মূলত (সুপ্ত) গুপ্ত সংগঠনের সশস্ত্র ব্যক্তিরা

সমাজ জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে দেশকে ব্যাপকভাবে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। বঙ্গবন্ধু এসকল বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে পেলেন প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার আওতায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের প্রোটেকশনে এই সমস্ত সশস্ত্র ব্যক্তিদের কার্যক্রম মোকাবেলায় গৃহীত গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান আইন কানুন অত্যন্ত দুর্বল ও অকার্যকর। সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইন কানুনের মাধ্যমে সশ্রস্ত্র সমাজ বিরোধীদের আটক ও ত্বরিৎ বিচারের ব্যবস্থা ছিল অনুপস্থিত। দেশের সামগ্রিক নৈরাজ্যিক অবস্থায় বিশ্লেষণের যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরি অবস্থার মোকাবেলায় জরুরি বিধানবলি, প্রনয়ন ও কার্যকর করা অনিবার্য করে তুলেছিল। পৃথীবির বিভিন্ন দেশে জরুরী বিধানবলি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত থাকলেও বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক ভাবধারায়ও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিধানবলী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে বিরত ছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সশস্ত্র রাজনৈতিক কার্যকর মোকাবেলার কৌশল উদ্ভাবন করতে গিয়ে দীর্ঘ দিনের লালিত গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে গড়ে ওঠা শেখ মুজিবকে মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়।

দেশের অগোছালো, অক্ষম ও অদক্ষ এবং মানসিক দিক থেকে দুর্বলভাবে সংগঠিত পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে এসব নৈরাজ্যময় আইন শৃঙ্খলার মোকাবেলাও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ছিল অসম্ভব এক ব্যাপার। সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে পরিচালিত পুলিশ প্রশাসন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তি যোদ্ধাদের সাথে পাল্লা দিয়ে কার্যক্রম ভূমিকা পালনে অক্ষম ছিল।

বস্তুগত অসুবিধা, সাংগঠনিক লজিস্টিক সাপোর্টের অপ্রতুলতা ক্রমবর্ধমান জন-নিরাপত্তাহীনতাকে প্রকট করে তোলে। সশস্ত্র তরুণদের ভয়ে ভীত পুলিশ কেন্দ্র ও ফাঁড়িগুলো অধিকাংশ স্থানে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকার মধ্যেই নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। ফলে সশস্ত্র শক্তি সমূহের দৌরাত্ম্যে মহকুমা শহর, থানা ও গ্রামাঞ্চলের জনগণ এক অসহায় অবস্থায় তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে।

১৯৭২ সালে ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বিবৃতি বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন কেবল মাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে থেকে গণ-পুলিশ বাহিনীর গঠন যা জনগণের বন্ধু হিসেবে সেবাধর্মী কাজে লিপ্ত থাকবে। কিন্তু যেসব পুলিশ মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিল কিংবা মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণের মধ্যেও অর্ধহারী পুলিশম্যান হিসেবে পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের জন্য জাতির পিতার আহব্বান তাদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি।

সশস্ত্র নাশকতা :

সামগ্রিক নাশকতামূলক কার্যকলাপে দেশের নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯৭৫ সালের ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুমটি বড় ধরনের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাটের গুদামে আগুন, খাদ্য গুদাম লুট এসবই গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য এক চ্যালেঞ্জ।

সশস্ত্র বিপ্লবের পর যেকোনো দেশে এ ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রম ও প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা প্রতিরোধে দলীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডারদের সশস্ত্রভাবে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। আওয়ামীলীগ দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রয়োজনে আওয়ামীলীগও দেশ প্রেমিক মুক্তিবাহিনীর হাত হতে যে সকল অস্ত্র জমা নেয়া হয়েছিল তা তুলে দিয়ে প্রয়োজনে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হবে। এটা করতে গেলে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা ও গণতান্ত্রিক লালিত পথ অন্বেষণকে বাতিল করে বিপ্লবী সরকারের ধারায় দেশ শাসনের সিদ্ধান্ত নিতে হতো। এ সমস্ত সশস্ত্র প্রতি বিপ্লবী কার্যক্রম দমনে বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির অনুশীলনও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তার পরম নিষ্ঠা ও অনুগত্য দেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টির ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় রকমের সুযোগ হিসেবে দেখা দেয়।

জাসদ ও আন্ডার গ্রাউন্ড সশস্ত্র গ্রুপের নেটওয়ার্ক মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী পরিণতি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সেনা বাহিনীর মধ্যেও বিপ্লবী পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য জনসভায় সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনার উস্কানী এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতীক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ বঙ্গবন্ধুকে প্রচলিত ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে আশাহত করে তোলে।

মিত্র-বাহিনীর প্রবর্তন :

স্বাধীনতার পর পরেই দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্বেগ জনক অবনতির ফলাফল বিবেচনা করে ১৯৭১ সনে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রচার বিভাগের গবেষণায় স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। মুক্তি বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর সুশৃঙ্খল *"চেন অফ কমান্ড"* স্থাপনে সামরিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও "বৈপ্লবিক উগ্রতা উটকো

বিপ্লবী আদর্শে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর পারস্পরিক মোকাবেলায় গৃহযুদ্ধের হুমকি অনিবার্য বলেই অনুভূত হচ্ছিল, সামরিক বাহিনীর কতিপয় নেতৃত্বের অসম্ভব উচ্চভিলাস ও ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র এবং সামগ্রিকভাবে সাময়িক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে শীতল দ্বন্দ্ব এবং প্রবাসী সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের কাঠামোর বাইরে অবস্থানরত সমান্তরাল মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব কর্মকৌশল স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের গতিধারা অনিবার্য সংঘাতের দিকেই ধাবিত হচ্ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কয়েকবারই মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বাধীনতার বৈরী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর আন্ডার গ্রাউন্ড নেটওয়ার্কের জাতিদ্রোহী তৎপরতা। সরকার ও সরকারি পাওয়ার প্লাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আধিপত্য বিস্তারের আত্মঘাতি প্রবণতাকে সমগ্র জাতিকে সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সমস্ত সংঘাতময় মুখোমুখির দিক সমূহ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এদেশে অবস্থানের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছিল। এরূপ অবস্থার যেকোনো ধরনের প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রতি বিপ্লবী সশস্ত্র তৎপরতা দমন, স্বাধীনতা বৈরীদের সমূলে উৎখাত ও ধ্বংস সাধন এবং অস্ত্র উদ্ধারের শত জটিলতার নিরসন না হওয়া পর্যন্ত

ভারতীয় মিত্র বাহিনী।

মিত্র ভারতীয় বাহিনীর অবস্থানের সময়সীমা দীর্ঘস্থায়ী হবারই সম্ভবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু জাতির জনকের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং দীর্ঘ দিনের এই বিশ্বাসের ভিত্তির কারণে বঙ্গবন্ধু এসব বিষয়ে কোনো তোয়াক্কা করেনি। দেশে ফিরে উল্লেখিত বাস্তব অবস্থা পরিদৃষ্ট ও তাঁর সহকর্মীদের মৃদু আপত্তি ও অনিশচয়তা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনা বাহিনীকে ত্বরিৎ গতিতে দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন অটল। কেননা দেশের মাটিতে বিদেশি মিত্র শক্তির সেনা বাহিনীর অবস্থান,স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সমূহের অপ-প্রচারের সুযোগ সৃষ্টির কোনো প্রকার অবকাশ প্রদান ছিল বঙ্গবন্ধুর নিকট যন্ত্রণাদায়ক। শুধু তাই নয় বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতি দেশের মাটিতে গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় কার্যক্রম এবং এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংহত করার জন্য অন্যান্য দেশের আশু স্বীকৃতি দেশের জন্য যা ছিল অতি জরুরি তার দিকে শত্রু পক্ষের তীর ছোঁড়ার কোনো প্রকার সুযোগ প্রদানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনিচ্ছুক।

জাতীয় মিলিশিয়া রক্ষী বাহিনী গঠন :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপর্যাপ্ততা ও অক্ষমতা এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের কার্যকর ও অক্ষমতা বঙ্গবন্ধুকে বলতে গেলে গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনায় বিরাট ঝুঁকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এই ঝুঁকির মোকাবেলায় সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্ভূত ও বিরাজমান পরিস্থিতির পেক্ষাপটে একটি প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীর গঠন ছিল অপরিহার্য। সেই অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পরপর গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠনের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে গ্রামীণ দলাদলি, কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে পূর্ব সক্রতা ও ব্যক্তিগত রেষারেষি প্রতিহিংসামূলক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানোর আশঙ্কায় গ্রামরক্ষী বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। একই সাথে তিনি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের আশু পরিকল্পনা বিবেচনা করে গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের অনুমোদনে গণতান্ত্রিক আইনানুগ ব্যবস্থাধীনে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এর জন্য সরকার দেশের অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতো ৭ মার্চ ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশের ২১নং ধারায় জাতীয় রক্ষী বাহিনী আদেশজারি করেন। জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠনের তাত্ত্বিক দিক উপস্থাপন করে এই বাহিনীকে ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার, বিশেষভাবে শাসক দল ও বঙ্গবন্ধুর "প্রাইভেট বাহিনী" হিসেবে উপস্থাপনের লক্ষে নানা ধরনের কাল্পনিক অযৌক্তিকতা, অতিরঞ্জিত কল্পকাহিনীর প্রচার প্রয়াস বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও সামরিক

বাহিনীর উচ্চ বিলাসী অংশ জাতীয় রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক তরফা সমালোচনায় যেসব গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার মধ্যে (১) রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রনালী ও নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ (২) বেপরোয়া অত্যাচার, নির্দয়তা এবং হত্যাকাণ্ডের মতো অভিযোগ (৩) অবশ্য এর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর মধ্যে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, সেনা-বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হবে। এবং রক্ষী বাহিনী তার স্থলাভিষিক্ত হবে। এরকম একটি ধারণার বাস্তব কারণ হিসেবে অস্ত্র উদ্ধার ও চোরা চালান নিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী সেনা বাহিনীকে যে সুর্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করে ছিলেন সে দায়িত্ব পালনে তাদের পক্ষপাত মূলক আচরণ ও ব্যর্থতা এবং তাদের প্রকটিত অক্ষমতা কাঠামোগত অস্তিত্বে রক্ষার তাদেরকে হীনমন্যতায় আক্রান্ত করেছিল। সেনা বাহিনীর বৃহৎ অংশই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়নি। অতএব তাদের মনে নানা ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অস্থিরতা ছিল ব্যাপক। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলক ৭৩ সনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ক্যান্টমেন্টের ভোট কেন্দ্রগুলোতে লক্ষণীয়ভাবে দৃষ্ট হয়েছে। সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায় হতেই জাতীয় রক্ষী বাহিনী সম্পর্কে নানা ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। রক্ষী বাহিনীর গঠন প্রণার্লা সামরিক বাহিনীর মতো সেকশন প্লাটুন কোম্পানি ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলে আইনগত ও বস্তুগত দিক থেকে এটি ছিল নিতান্তই এক প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী।

জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন প্রক্রিয়া কার্যক্রম ও প্রশাসনিক বিন্যাস ও তাদের করণীয় দিক সমূহ এবং অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে তার অবস্থানগত বিষয়াদিক সকল কিছুই জাতিয় রক্ষী বাহিনীর বিলে অর্ন্তরভুক্ত হয়েছিল। জাতীয় রক্ষী বাহিনীর আদশের প্রতিটি অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করলে অফিসার ও সদস্য নিয়োগ জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে একটি প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীতে উত্তরণের সুযোগ বৈধ ভিত্তি প্রদান করে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি রোধে রাজনীতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিংস্র সশস্ত্র ব্যক্তিদের সংগে তাদের আচার আচরণের সবটাই যে নিয়মানুগ হয়েছে একথা মনে করার কারণ নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আচরণ বেপরোয়া ও বাড়া-বাড়ি মনে হলেও বেআইনি অস্ত্রধারীদের সশস্ত্র আক্রমণের নৃশংসতার পাশাপাশি বিচার করলে রক্ষীবাহিনীর কর্মকাণ্ড যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হবে। নতুন এই বাহিনীর ব্যতিক্রম ধর্মী বাড়া-বাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে তাদের কার্যক্রমকে প্রচলিত দণ্ড বিধির আওতাধীন করা হয়। এধরনের কথিত বাড়াবাড়ি ও শৃঙ্খলা বহির্ভুত কার্যক্রম পরিচালনায় জাতীয় রক্ষী

বাহিনীর সংশ্লিষ্ট অফিসারও সদস্যদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। তার নজির অনেক। জাতীয় রক্ষী বাহিনীর আচার-আচরণ বিশেষ করে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রমকে সব সময়ই বিকৃত সমালোচনা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বারংবার আবেদন অনুরোধ নির্দেশ উপেক্ষা করে এমনকি সেনা বাহিনী নামিয়েও যখন আশাপ্রদ অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হচ্ছিল না এবং অস্ত্রধারী গ্রুপগুলোর গৃহীত নাশকতামূলক কার্যক্রম, হত্যা, লুণ্ঠন, হাইজ্যাক জনজীবন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই অস্ত্র উদ্ধার যার দায় দায়িত্ব পড়েছিল জাতীয় রক্ষী বাহিনীর উপর। জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আন্তরিক উদ্যোগ ও দ্রূত অর্থানুকূল্য প্রশাসনের সকল স্তরে। যার কারণে এই বাহিনীকে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব বাহিনী বলে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহকে উপাদান জুগিয়েছিল। চেতনা ও উন্নতর প্রশিক্ষণে উদ্দীপ্ত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত রক্ষী বাহিনী স্বাধীনতা ও সমাজ বিরোধীদের এবং অগণতান্ত্রিক শক্তি গুলোর নিকট ছিল বিভীষিকার মতো। জাতিয় রক্ষী বাহিনী ১৯৭২ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩,৩৩০টি আগ্নেয়াস্ত্র ৪৬ লক্ষ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। ১৯৭৩ সনের নভেম্বর পর্যন্ত উদ্ধার করেছে ৩,৮১৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ৬২ লক্ষ ৪ হাজার গোলা বারুদ।

ভারতীয় সেনাবাহিনী এদেশে দ্রুত আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কারণে যে সব অস্ত্র উদ্ধার করেছিল তা ছিল চীন প্রদত্ত পাকিস্তানিদের। এসকল অস্ত্র পুনরায় ফেরৎ এনে রক্ষী বাহিনীকে সুসজ্জিত করে। এছাড়াও জাপান থেকে আনা গাড়ি নতুন ব্যারাক ও দালান কোঠা নির্মাণ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরূপ মানসিকতা তৈরি করে। তৎকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য বরাদ্ধ রাখা হয়েছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার পিছনে। তখন সীমান্তে বহি-শত্রু হামলা বা আক্রমনের আশঙ্কা ছিল না। সময় ছিল জাতীয় সেনা বাহিনী গঠনের পর্ব, পাকিস্তানে আটক সেনাবাহিনী তখন ফিরতে শুরু করেছে। তবুও প্রতিরক্ষা খাতের অর্থ বরাদ্ধের খতিয়ান মিলালে দেখা যাবে সেনা বাহিনীর প্রতি উপেক্ষা করা হয়নি।

সেসময়ে জাতীয় জীবনে অস্থিরতা, হিংস্রতা এবং দলীয় সর্বক্ষেত্রে আধিপত্ত্য বিস্তারের মানসিকতা চরম অসহিষ্ণুতা আবেগের গভীর ঘৃণা জাতির মন মানসিকতাকে এমন ভাবে তৈরি করে ফেলেছিল যে, গুজবকেই সত্যি বলে মনে

করতো। নানা রকমের মিথ্যা প্রচারেরই প্রতিদিনের আত্মলিপির বিধানবলে স্বীকৃত হচ্ছিল। দেশের ক্রমবর্ধমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাপক হুমকির প্রেক্ষিতে সরকার যেকোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করুক না সাথে সাথেই খবর কাগজে বের হতো তার একটি বিকৃত ব্যাখ্যা। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, খুন এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ব্যাক্তিদের যখনই গ্রেফতার বা দমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন শোরগোল করে বলা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে অন্যায়ভাবে এরেস্ট করা ও তাদের উপর অত্যাচার চলছে। আবার যখন তাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা হয়েছে তখনই তারা ঐ আটককৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেবার সমালোচনা করছেন এবং তাদের আটক না করার জন্য পুনরায় সরকারের উপর দোষারোপ চাপিয়েছেন। যাতে জনগণ সব সময় বিভ্রান্ত হতো।

যেমন পুলিশ সদস্যদের নিকট থেকে অস্ত্র ছিনতাই করে নিত, এই অস্ত্র কেড়ে নেয়ার নির্দেশ দিত দল। পুলিশ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেই পার্টি কর্মীদের রক্ষী বাহিনী আটক করেছে বা বল প্রয়োগ করা হয়েছে তখন রাজনৈতিক দলগুলো একতরফা রক্ষীবাহিনীকে দোষারোপ করেছে। এতে করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অকার্যকর করে তুলেছিল।

এমনিভাবে গুপ্ত হত্যা, চোরাচালানি, মজুতদারীসহ সমাজ বিরোধীদের দমনে রক্ষী বাহিনীর কার্যক্রমকে নৈতিক বা সুষ্ঠু ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে কোনো সময় বিশ্লেষণ করেনি।

প্রতি-বিপ্লবীদের এই উগ্রপন্থা যে কত ভুল ছিল, পরবর্তীতে নিজেরাও স্বীকার করতে হয়েছে। তাদের ভুলের জন্য কত ব্যক্তি বিপদগামী হয়ে আত্মহুতি দিতে হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই তাদের ভুলের খেসারত হিসেবে তাদেরকেই বহন করতে হবে।

এইসব সমাজ বিরোধী ও উগ্রপন্থী শ্রেণি শত্রু খতমের নামে আওয়ামীলীগ কর্মী বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের যেখানেই তারা সুযোগ পেয়েছে হত্যা করেছে। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে দেশের সাধারণ ও প্রচলিত অস্ত্র আইন অনুসারে জাতীয় সংসদ সদস্য, বিচারপতি ও অন্যান্যদের মধ্যে “নন প্রহিবিটেড” অস্ত্র প্রদান যা জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হয়েছিল। অবশ্য এর সঙ্গে সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিস্থিতিকে জটিলতার করতেও বিরোধীদের প্রচারে যুক্তি বাড়াতে

সাহায্য করেছে।

বিপ্লব উত্তর পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু বলতেন, "বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশে কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই। আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও বিশ্বাস করি।"

বিকল্প অন্বেষণ :

মাত্র তিন বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি উল্টে যায়। তিনি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় ফিরে গেলেন। সংবিধানের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীনভাবে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা ও শোষিতের গণতন্ত্র ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় সাংবিধানিক পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এছাড়া জাতির সামনে বিকল্প কোনো পন্থা নেই।" তিনি বলেন, "বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্রের নামে নৈরাজ্য ফিস্টাইল অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। শোষকের স্বার্থে ব্যবহৃত এই গণতন্ত্রে ও শাসন ব্যবস্থা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে।" তিনি বলেন, "প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতেও শোষণ অবিচার নির্যাতন দুরীকরণের অপরিহার্যতাতেই সংবিধানের এই মৌলিক পরিবর্তন আনতে হয়েছে।"

বাংলাদেশের মতো দরিদ্রপীড়িত একটি দেশে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা ও তার উপর ভিত্তি করে সরকার পরিচালনার ব্যর্থতার কার্যকরণ সমূহ শুধুমাত্র সরকারের অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিরাজমান অবস্থা ও বিরোধী দল সমূহের কার্যকলাপ এবং শ্রেণিশক্তির ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের চেতনা মিশ্রতা ও ভিন্নতা এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রয়াস সাধনে কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিত থাকায় বঙ্গবন্ধু এই সিদ্ধান্তের উপনীত হতে পেরেছিলেন যে, তার দলের নেতা কর্মীরাও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশে উদ্ভূত ও বিরাজমান সংকট নিরসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনমত গঠনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭৪ সালেই বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সভাপতির পদ ছেড়ে চলে আসেন। আওয়ামীলীগের একাংশের দুর্নীতি ও ব্যর্থতা বিক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধু বিরোধীদলের মতো

নিজ দলের নেতা ও কর্মীদের তীব্র সমালোচনা করেন। বঙ্গ বন্ধুর নিকট এটাও পরিষ্কার হয়েছিল যে, দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনতি আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সঙ্গে নব উদ্ভূত লুটেরা শ্রেণির আঁতাত, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, জনজীবনের নিরুপত্তা হীনতা, বাহ্যিক দুর্নীতি, লুটতরাজ এবং আন্ডার গ্রাউন্ড নেটওয়ার্কের সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা চোরা চালানের মতো রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হবার ফলে আওয়ামীলীগের একাংশের গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কের জনমনে ব্যপক প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সোনার বাংলা গড়ার পথে যে সমস্ত বিষয়ে ও বিষয়ীগত প্রতি-বন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার মধ্যে বৃটিশ পাকিস্তানের রেখে যাওয়া পশ্চাদপদ প্রশাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের সশস্ত্র গুপ্তহত্যার প্রেক্ষিতে জনজীবনের নিরাপত্তার অভাব, সন্ত্রাসী তৎপরতা, ব্যাপক অর্থনৈতিক ধ্বংস সাধন, দুর্যোগময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে খাদ্য সংকট ও পর-নির্ভরশীলতা, শিক্ষিত শ্রেণীর সুবিধাবাদীতার স্বরূপ এবং দুর্নীতিতে আগ্রহী এলিট শ্রেণির অবৈধ অর্থ উপার্জনের অশুভ ভূমিকা। জাতীয় জীবনের এই গভীরতার সংকট ও সমস্যা নিরসনে প্রচলিত গণতন্ত্র এবং তার থেকে উদ্ভূত কর্তৃত্বশীল আমলাতন্ত্রের ব্যর্থতা বঙ্গবন্ধুকে বিচলিত ও প্রথাসিদ্ধ শাসন ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন :

১৯৭৪ সালে সশস্ত্র গ্রুপও স্বাধীনতা, গণতন্ত্র বিরোধী চক্রের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জাতির জনকের সামনে বিব্রতকর অবস্থা নিয়ে হাজির হতে থাকে। গ্রামগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রত্যহ সশস্ত্র ডাকাতি, হাইজ্যাক, পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের খুনের মতো অভাবনীয় ঘটনা সমূহ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছিল।

সশস্ত্র গ্রুপের খতমের রাজনৈতিক লাইনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অচল করে দেয়ার চ্যালেঞ্জ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সামনে উপস্থিত হয়। বাখেরগঞ্জ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোতাহের উদ্দিনকে হত্যা করা হয়। ১৯৭৪ সালে ১৫ জানুয়ারি সংসদে শোক প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু বলেন "কিছু সংখ্যক দল ও প্রতিষ্ঠান আছে যারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা নিরপরাধ গ্রামের লোককে হত্যা করে চলেছে। কিন্তু যারা এসব কাজ করছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হলে, ধরা হলে, বলা হয় আমাদের গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে গেল। এসকল অধিকার চলবে কিনা তা ভাববার সময় এসেছে। আমি আশা করবো, যারা এই পথ অবলম্বন

করছে তারা এই পথ ত্যাগ করবে এবং গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করবে।" প্রধানমন্ত্রীর এই অনুরোধকে সশস্ত্র গ্রুপগুলো বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে থাকে। একই সঙ্গে কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদার, চোরা কারবারী এবং অর্ন্তঘাতমূলক কার্যকলাপ জাতীয় জীবনে চরম বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি করে।

নতুন বিধান :

সকল অবস্থা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধুর নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত আইন বিধান দিয়ে নব উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় দুঃসাধ্য। অপরাধের পরিমন্ডল ও আঙ্গিক যেখানে পরিবর্তিত হয়েছে সেখানে অপরাধীদের দমনের ব্যবস্থা ও কাঠামো এবং বিধি বিধান পরিবর্তন জরুরি হওয়ায় ১৯৭৪ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি "স্পেশাল পাওয়ার এ্যাকট" নামে একটি বিশেষ আইন জারি হয়। কতিপয় গুরুতর অপরাধ, দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করা শাস্তি বিধান এবং এত দত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এই আইন জারী হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা রাখা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পাদন থেকে বিরত রাখার স্বার্থে সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখতে পারবেন। লাইসেন্স, পারমিট, রেশন দ্রব্যের বৈআইনি ক্রয়-বিক্রয়, মজুত করন, ফেরারি ব্যক্তিদের আটকাদেশ কার্যকরী করার ক্ষমতা এই আইনে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, কালোবাজারী, মজুতদারী, নোট, মুদ্রা সরকারি স্ট্যাম্প জাল করা, রেল পথ, রাস্তা, ব্রীজ, বন্দর, বসতি ঘর, বিমান বন্দর যন্ত্রপাতির কলকবজার ক্ষতি সাধন, খাদ্র্য দ্রব্যে ও ঔষুধ পাতির ভেজাল ও চোরা কারবারীর মতো জঘন্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর বিধান যুক্ত করা হয়। ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে মৃত্যদন্ড ও ফাঁসির ব্যবস্থা সম্বলিত বিধানের ফলে জনজীবনে স্বস্তি শান্তি ফিরে আসতে থাকে।

স্বাধীনতা স্বপক্ষের রাজনৈতিক ঐক্য :

আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও জনজীবনে শান্তি শৃঙ্খলার ফিরে আনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর দেশ প্রেমিক প্রগতিশীল দল গোষ্ঠীকে নিয়ে ঐক্য জোট গঠনের পক্রিয়া শুরু করলেন। আওয়ামীলীগ, সিপিবি ও ন্যাপ প্রাথমিক পর্যায়ে এই তিনটি দল নিয়ে তিন দলীয় ঐক্য জোট গঠন করতে সমর্থন হন। ১৯৭৩ সালে মার্চের নির্বাচনের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে বৃহত্তর মোর্চা গঠনের কথা ভাবতেন। সেই ভাবনায় বাস্তবরূপ ১৯৭৩

সালের শেষ দিকে এসে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি, সমাজ বিরোধী দুস্কৃতিকারীদের অবাধ তৎপরতা, সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ফ্রিষ্টাইল রাজনীতির অশুভ পাঁয়তারা, আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের একাংশে চরম দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে বঙ্গবন্ধু দেশকে প্রচলিত ধারা থেকে নতুন ধারায় নিয়ে যাবার সংকল্পে উন্নীত হন। শুধু তাই নয় তার লালিত বহুদিনের সংগ্রামে গড়ে ওঠা আওয়ামীলীগের দায় দায়িত্ব তিনি বহন করতে সম্মত হলেন না। আওয়ামীলীগের একাংশের বদনাম স্কন্ধে তুলে নিতে বঙ্গ বন্ধু আর উৎসাহিত ছিলেন না।

এই বাস্তব অবস্থাতেও নিরুঙ্কুশ জন সমর্থনে উদ্দীপ্ত বঙ্গবন্ধু তার প্রতিশ্রুতি শোষন মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার পথে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলাসিতাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে জনগণের আকাংঙ্খা বাস্তবায়নে তাকে একাকীই এগিয়ে আসতে হলো।

জরুরি অবস্থা :

১৯৭৪ সালে ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা জারির মধ্যে দিয়ে।

(১) আইনের পরিপন্থী যে কোনো অপরাধ সংগঠনের দায়ে নিবর্তন মূলক আটাকাদেশ।

(২) চোরা চালান অবৈধ মজুদদারী কালো বাজারী বে-আইনি অস্ত্রধারণ জালিয়াতি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা অথবা ধ্বংসত্বক তৎপরতা চালানোর পরিকল্পনা ভেজাল সামগ্রী প্রস্তুত, দুর্নীতি ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ সমূহের বিচারের কঠোর বিধান।

(৩) সংবাদপত্রের দায়িত্ব হীনতা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের মতো ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়।

জনজীবনে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারে সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্জন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখতে পেলেন পুরানো বাঁধা ধরা ছকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা শুধু অসম্ভব নয়, অযৌক্তিক বটে। অত্যন্ত সর্তক অথচ ধীর পদক্ষেপ তিনি প্রথমে সংবিধানে পরিবর্তন এনে নিবর্তন মূলক আটকাদেশ বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জরুরি অবস্থা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের পরিপূর্ণরূপ দানের লক্ষে এগিয়ে গেলেন।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত :

১৯৭৫ সালের ১৯ জানুয়ারি আওয়ামীলীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও সংসদীয় দলের

যৌথ সভায় জাতীয় সমস্যা সমূহের সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় তার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সংসদে পেশ এবং পাশ হয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ভার বঙ্গবন্ধুর উপর অর্পিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা :

বঙ্গবন্ধু সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের উপর ভরসা রেখে অবিচল আস্থায় ঘোষণা করলেন, দ্বিতীয় বিপ্লবের। তিনি বললেন, "স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল আমার জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়:- প্রথম বিপ্লব। অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষে ২৫ মার্চ জাতীয় সংসদে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে গেলেন।

গণতন্ত্রের নতুন কৌশল :

সোনার বাংলার প্রতিশ্রুত আকাঙ্খার নির্মাণ লক্ষে সংকট আবর্তিত জাতিকে টেনে বের করে নিয়ে আসার জন্য জরুরি অবস্থা জারি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। জরুরি অবস্থা জারীর ফলে বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক এলিট গ্রুপ ব্যতীত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট এর সুফলদায়ক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও আইন শৃঙ্খলার উন্নতির প্রবণতায় আশ্বস্থ হয়ে উঠতে থাকে। প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য, লুট হাইজ্যাকের ঘটনাও হ্রাস পাচ্ছিল। এজন্যই জরুরি অবস্থার ঘোষণার (২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সাল) মাত্র ২৭দিন পর ১৯৭৫ সনের ২৫ জানুয়ারি পার্লামেন্টে চতুর্থ সংশোধনী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতির অধীনে নিয়ে আসা হয়। এর সঙ্গে ব্যতিক্রম ধর্মী কৌশল গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি মুজিব শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু শোষণ মুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্র নির্মানের লক্ষে অসুবিধা সমূহ ও বঙ্গবন্ধুর বিবেচনার মধ্যে ছিল।

বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের স্বকীয় ও পার্থক্যগত বৈশিষ্ঠ সহজাত প্রবনতায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুরোপুরি দায় দায়িত্ব পালন না করা সত্ত্বেও সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৎ রাজনৈতিক ক্যাডারদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ উক্ত প্রশাসন কাঠামোয় ছিল সম্পূর্ন নিষিদ্ধ। অন্যদিকে আমলাতন্ত্রকে

আদর্শগতভাবে "মটিভেট" করে তাদেরকে সোনার বাংলা গড়ার সৈনিক রূপে গঠন ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। কেননা উপনিবেশ কাঠামোর লালিত প্রশিক্ষিত ও অভ্যস্থ আমলাদের মানসিকতার পরিবর্তন ও প্রচলিত গণবিরোধী প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইতিবাচক গতিশীলতা অজর্নের আত্মীকরণ তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্য পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যুবশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ সমাজ রূপান্তর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে তখন পর্যন্ত ছিল উম্মুক্ত ও ইচ্ছুক।

এই সমস্ত বিবেচনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সমাজ ও রাষ্ট্র বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে সম্পৃক্ত। এর সংগে বঙ্গবন্ধুর নিকট এটাও অত্যন্ত পরিস্কারভাবে উত্থাপিত হয়েছিল যে, টেকনিক্যাল দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলই শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে একটি জাতীয় ঐক্য মতের পৌঁছতে সমর্থিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা অলিখিত বিক্ষব্ধতার ছাপ স্পর্শ থাকলেও তিনি সমাজতন্ত্র ও এর ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে খোলাসা করেই বলেছিলেন। রাজনৈতিক লক্ষ নির্ধারণে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য সকল রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অবসান ঘটিয়েছিল।

গণতন্ত্র :

শোষিতের গণতন্ত্র বলতে বঙ্গবন্ধু এমন এক গণতন্ত্রকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, গণতন্ত্র শোষিত মানুষের জন্য তাদের স্বার্থে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। এর অর্থ আজকে যে প্রচলিত গণতন্ত্র রয়েছে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল শোষিত শ্রেণি সেই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে নিজেরাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে। অধিকাংশ জনগণের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে। গণতন্ত্রের অর্থ হলো, অল্পসংখ্যকের উপর অধিকাংশের শাসন। কিন্তু যে গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে তা হচ্ছে, অধিকাংশের উপর অল্পাংশ ধনিক, বনিক, শোষক শ্রেণির শাসন। তাই অল্পাংশের জন্য যে গণতন্ত্র সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা শোষকের গণতন্ত্র।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই অল্পাংশের গণতন্ত্র তথা শোষকের গণতন্ত্রকে বাংলার মাটি হতে চিরদিনের মতো বিতাড়িত করে তদস্থলে অধিকাংশের গণতন্ত্র তথা শোষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু পরিস্কারভাবে বলেছেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা

সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। আগেও আমরা দেখেছি যে গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে, দেখা যায় সেইসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার। সেই গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্র নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ আছে, তাতে যেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। অনেক আলোচনা হয়েছে। কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষন করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য প্রথমে ব্যাংক, বীমা, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কল, সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে।”

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত ও ঘোষিত শোষিতের গণতন্ত্র

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত ও ঘোষিত শোষিতের গণতন্ত্র হলো গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণে তাদের স্বার্থে পরিচালিত। অর্থনৈতিকভাবে এ গণতন্ত্র শোষনের অবসান ঘটায়। জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় খাত গড়ে তোলে রাজনৈতিকভাবে এ গণতন্ত্র ব্যক্তি সমাজের নিকট দায়ী থাকে। মৌলিক অধিকার ভোগ করে এবং দায়িত্ব পালন করে। এ গণতন্ত্র বস্তুগত গ্যারান্টির মাধ্যমে মৌলিক অধিকারকে কার্যকরকেও অর্থবহ করে তোলে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে শোষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। শোষক শ্রেণির দখলে বিদেশি প্রচার মাধ্যমে তাদের স্বার্থে এবং পুঁজিবাদী ভাবধারায় গড়ে ওঠা মানসিকতায় শোষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও কার্যকর ফর্মুলা শোষকগোষ্ঠী ধনিক, বণিক, জোতদার, ভূস্বামী এবং লুটেরা দুর্নীতিবাজ শ্রেণির নিকট আতঙ্কের দৃশ্যমান বিষয় হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে। এই ভীত প্রদ চিত্রের বহিঃপ্রকাশ সার্বক্ষণিক প্রচারের মধ্যে যে সাধারণের নিকট এর বিরূপ দিক তুলে ধরতো।

এখানে বিচার্য বিষয় বঙ্গবন্ধুর শোষিত গণতন্ত্র আসলে কী? এটা কি গণতন্ত্র নাকি স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিমূল? কারণ শোষিত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার লক্ষকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু চতুর্থ সংশোধনী ও এক পার্টি সিস্টেম প্রবর্তন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "এমেন্ডমেন্ড কনস্টিটিউশনে যে নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি, তাও গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র"। তিনি বললেন, "আমি চাই শোষিতের গণতন্ত্র শোষকের নয়।"

জাতীয় ঐক্য :

সদ্য স্বাধীন বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় দলসহ সকলেই যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে এক তখন তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বহুমুখী রাজনৈতিক দল সমূহের পার্থক্যগত অস্তিত্ব বজায় রাখার আদৌও প্রয়োজন নেই। সেজন্য জাতীয় প্লাটফর্ম রূপে গঠন করলেন (বাকশাল) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ।

জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে শাসন-তান্ত্রিক বিধানে গৃহীত একক জাতীয় দলের

মাধ্যমেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থাদি সকল ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর। তিনি তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছেন। ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাও প্রাশাসন দিয়ে সমাজের বুক হতে স্থায়ী ভাবে চেপে বসা দুর্নীতি, চোরা চালান ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করা সম্ভব নয়। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাদির আওতায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথিবীর কোথাও সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

নিপীড়িত দরিদ্র জনগণের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা, মুক্তিকামী মানুষের প্রতি দ্ব্যর্থহীন অনুরুক্তি তাঁর মনে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য নিজেকে অনুকরণীয় নেতা হিসেবে উপস্থাপনের বিষয়টিও তাঁর মনে কাজ করে ছিল।

নতুন প্রত্যাশা :
শোষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার একদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধুর হাতে অর্পিত হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে জনমনের নতুন প্রত্যাশা জাগ্রত হয়েছিল। জনগণের প্রত্যাশা ছিল নতুন ব্যবস্থাধীনে জন নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, দ্রব্য মূল্য হ্রাস পাবে এবং আইন শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখবে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিদিন সহস্র লোক বাকশালের সদস্য পদের জন্য আবেদন পাঠাতে থাকে। এক বিরাট সংখ্যক সাংবাদিক, শ্রমিক সংগঠন, গণ সংগঠন, শ্রেণি ও পেশাজীবি সংগঠন, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি, মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের শ্রেণি ও পেশার মানুষ বাকশালে যোগদানের আবেদন করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৮ জন শিক্ষক, কর্মচারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিটের প্রস্তাবে বাকশালের সঙ্গে একত্মতা ঘোষণা, ভাষানী ন্যাপ, জাসদসহ অন্যান্য নেতাগণ ব্যক্তিগতভাবে বাকশালে যেগাদান অব্যাহত রাখে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভাষানী ন্যাপের সেক্রেটারী জেনারেল কাজী জাফরের আলোচনার ফলে তাদের বাকশালে যোগদানের বিষয়টিও স্থির হয়ে যায়। জাসদের সিরাজুল আলমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার এ কথাও রাজনৈতিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে জাসদ বাকশালে যোগদান করতে যাচ্ছে।

জাতীয় ঐক্য গঠনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শোষকদের স্বার্থে পরিচালিত পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পরিবর্তে শোষিত শ্রেণির স্বার্থে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি,

অধিকার ও বিধানবলি প্রণয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নব বিধান। এই গণতন্ত্র রাজনীতিতে শোষিত শ্রেণির ব্যাপক অংশ গ্রহন এবং তাদের আর্থ- সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং এই বৈষয়িক উন্নতি বিধানের বৈপ্লবিক সুযোগ এনে দেবার পাশাপাশি শোষক শ্রেণি কর্তৃক অবৈধভাবে পেয়ে আসা সুযোগ ও অধিকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

আমলা সেনাবাহিনী :
রাষ্ট্রের দুটি প্রধান শক্তি সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র যা গড়ে উঠেছে শোষক পুঁজির পাহারাদার ও শ্রেণি শাসন ও শ্রম শোষণের শানিত হাতিয়ার হিসেবে তাদের জন্য শোষিত শ্রেণির পক্ষে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক চর্চার অধিকার স্বীকৃতি ব্যতীত এবং তাদের শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভ্যান গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালনের গণতান্ত্রিক চর্চার একক পার্টি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা জরুরি ছিল, যা বহুদল ভিত্তিক তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আদৌও সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী দর্শনের আওতায় সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ কেবল মাত্র স্বৈরতন্ত্রের হাতকেই শক্তিশালী করে যা পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির একটি মারাত্মক ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত। অন্য দিকে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ার লক্ষে কথিত দর্শনের আওতায় এসব রাষ্ট্রীয় শক্তি সমূহের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি শোষিতের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করবে। এক্ষেত্রে বহুদলীয় বুর্জোয়া দর্শনের পরিবর্তে একদলীয় গণতান্ত্রিক দর্শনের অপরিহার্যতার কার্যকারিতা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন :
চতুর্থ সংশোধনীর বিভিন্ন ধারা ও বিধানবলি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয়ে পরিষ্কর বুঝা যায় রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার বিভিন্ন স্তর সমূহে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করার বিধান সম্বলিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং পার্লামেন্ট সদস্য, জেলা গভর্নর, থানা গভর্নর এবং গ্রাম সমবায়ের মতো রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিটের প্রতিনিধি নির্বাচনে সর্ব ক্ষেত্রে ছিল প্রযোজ্য বিধান বলে সুনির্দিষ্ট। সর্বজনীন প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার এই চমকপ্রদ গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যে ঈর্ষার বিরূপ সমলোচনা তা একমাত্র অন্ধ আক্রোশ। চতুর্থ সংশোধনী আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সমন্বয়।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত একক জাতীয় দল গঠনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রও সমাজ শক্তি সমূহকে রাজনৈতিক বলয়ের অঙ্গীভূত করে উৎপাদন শক্তির সহায়ক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। গণবিরোধী ও গণবিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে খর্ব এবং পুরনোধাচের মূল্যবোধের কাঠামোয় বেড়ে ওঠা সেনাতন্ত্রের গণবৈরিতা ও গণশত্রুতার পূর্বতন অভিজ্ঞতা বঙ্গবন্ধুর মানস চেতানায় নবলব্ধ ধারণার বিন্যাসে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, তার সেনাবাহিনী হবে পিপলস্ আর্মী। যারা জনগণের পক্ষে, তাদের স্বার্থে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে সুখে দুঃখে একাত্ম হবে এবং জনগণের জন্যই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে জাতিগঠনের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত থাকবে। একটি বিচ্ছিন্ন নিপীড়নকারী রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসেবে বিশেষভাবে জনগণ থেকে দূরে কর্তৃত্বশালী, কোটারীশক্তি হিসেবে সেনাবাহিনী বিবেচিত হবে না। চতুর্থ সংশোধনীর বিধানবলিতে সেনা-বাহিনীকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রজ্যবাদী ও শোষক শ্রেণির চিরায়ত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিপরীতে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত, সম্পূরক ও সহায়ক মিত্রশক্তির সারিতে উজ্জ্বল অবস্থানে ভিত্তি করে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় বঙ্গবন্ধু এই নবতর পদক্ষেপ সকল ব্যক্তিক, গোষ্ঠিক ও দলীয় এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সৎ আদর্শবাদীদের রাষ্ট্রগঠনে সরাসরি অগ্রাধিকার প্রদান, তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে উল্লেখিত হবে।

জাতীয় একদল গঠনের প্রতিক্রিয়ায় (বাকশাল) ওয়ান পার্টি সিস্টেম বলে বিবেচিত হলেও শুধুমাত্র দুর্নীতিবাজ, দুস্কৃতিকারী, সমাজ বিরোধী, জননিরাপত্তা বিরোধী, হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা অবিশ্বাসীদের জন্য জাতীয় দলের সদস্য প্রদান রহিত ছিল।

বাকশাল গঠন তন্ত্রের সমালোচনা :

বাকশাল গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার সামগ্রিকতা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করলে সংগঠনের নীতি সমূহে গণতান্ত্রিক প্রণালী সদস্যপদ প্রদানে গণতান্ত্রিক রীতি ও কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বিধিবদ্ধ প্রদানে গণতান্ত্রিক রীতি ও কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই বিধিবদ্ধ এবং বিধান ছিল যে, জাতীয় দলের (বাকশালের) সদস্যবর্গ জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সংস্থা সমূহে প্রার্থী যোগ্যতার

অধিকারী হবেন। বাকশালের পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের কার্যকর অনুশীলন ব্যবস্থাদি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়কতার নীতি সমূহ শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিন্যাসে দলীয় চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উপর কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের সর্বময় বাধ্যবাধকতা সর্বোপরি দলীয় কাউন্সিলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের বিধানবলি প্রথমত দলীয় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির উপর এর নিরঙ্কুশ প্রযোজ্যতা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আওতায় আমলাতন্ত্র সেনাতান্ত্রিক চক্রান্তের প্রতিরোধে গণতন্ত্র সংরক্ষনের ও বিকাশের মৌলিকতার বিষয়টি আলোচনা না করে বাকশালকে এক দলীয় স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কীত করে এর বিরূপ সমালোচনা করে পুজিবাদী স্বার্থন্বেষী মহল।

সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট বঙ্গবন্ধুর এই রাজনৈতিক দর্শন গবেষণার বিষয় বলে বিবেচিত হলেও সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনগণকে আজ পর্যন্ত এর সুফল সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হয়নি। যার কারণে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বা বাকশাল গঠনের ব্যাপারে জনগণ বিভ্রান্তের মধ্যে আছে। জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন, জনগণ বিমুখ জনগণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক এবং দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সর্বস্তরের জনগণের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসনিক গণতন্ত্রায়নের লক্ষে ঘোষণা প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক প্রশাসন পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে পিপলস্ আর্মীর কনসেপ্ট ও কাঠামোর গড়ে তোলার সিস্টেমের ঘোষিত নীতি ও কর্মধারা সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিকতা যা সব সময়ই সমাজ বদলের সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করবে।

প্রশাসনিক গণতন্ত্রায়নে সঙ্গে সম্পর্কীত জাতীয় ঐক্য গঠনের স্বার্থে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি গঠনে প্রতিটি লোকের শ্রম ও মেধার প্রয়োগ ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই লক্ষে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ বাহিনী, রাজনীতিবিদসহ সকল শ্রেণির ও পেশার লোকদের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের দায়বদ্ধতায় নিয়জিত করা।

সমাজের সচেতন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবি, সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও সৃজনশীলতা এবং পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাসও নীতির ঐক্য ও একমুখিতার সমন্বয়ে জাতি গঠনের প্রয়োজনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনগণকে নিয়ে জাতীয় ঐক্য ও মোর্চা পড়ে তোলা যার সুনির্দিষ্ট লক্ষ ছিল স্বনির্ভরতা তার লক্ষে স্বশাসিত শৃঙ্খলা, উৎপাদন বৃদ্ধি। এর সঙ্গে বাংলাদেশের বিরাজমান পরস্থিতিতে শোষণ, দুর্নীতি, নিপীড়ন, অত্যাচার অবিচার

মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের স্বার্থে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এরূপ বৃহত্তর গণতান্ত্রিক গতিশীল ধারার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার লক্ষ শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণ তথা শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে তিনি প্রবর্তন করলেন ওয়ান পার্টি সিস্টেম। এক পার্টি পদ্ধতি জনগণের নিকট অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট, নেতৃবৃন্দ ছিল অনভিজ্ঞ এবং অনভ্যস্থ। বৃটিশ প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধরণ-ধারণ ও কায়দা-কৌশল মধ্যবিত্ত শ্রেণির, সুবিধাবাদী শ্রেণির উটকো সুযোগের আনুষাঙ্গিক ভাবধারায় সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে ওয়ান পার্টি সিস্টেম এবং তার প্রয়োগিক অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল ভীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আওয়ামীলীগের ছত্রছায়ায় এবং বিদেশি ঋণে পুঁজির বলয়ে এমন সব উঠতি ধনিও লুটেরা বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র দ্বিতীয় বিপ্লব প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দৃঢ় অঙ্গীকারের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর কঠোর সিদ্ধান্তের প্রতিফলন দেখে আসন্ন বিপদের মধ্যে পড়ার চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ এসব লুটেরা, সমাজ বিরোধীদের সমাজের বুক থেকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞায় ১৯৭৪ সালের ৬ জুলাই আওয়ামীলীগ পার্লামেন্টারী ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ফায়ারিং স্কোয়াড গঠনের যে সুপারিশ ছিল তাও তাদের মনে ভয়াবহ আতঙ্কের কারণ হিসেবেই বিদ্যমান ছিল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবরে দুর্নীতি গ্রস্থদের হাফ ছেড়ে বাঁচা :
বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরে দুর্নীতি গ্রস্থতারা প্রথম সুযোগেই বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি (বাকশাল), শোষিতের গণতন্ত্র এবং ওয়ান পার্টি সিস্টেমকে আত্মস্বীকৃত খুনিদের সঙ্গে স্বৈরাচার ও এক নায়কতন্ত্র বলে সর্বস্বরে শ্রেণি মিত্রদের সাথে অপপ্রচারে সমর্থন যুগিয়েছে। এদের সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র ওয়ান পার্টি সিস্টেমকে কাল্পনিক স্বৈরতান্ত্রিক বিভীষিকার প্রচারও করে গণতন্ত্র হত্যার কাঠ গড়ায় বঙ্গবন্ধুকে আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করে চলেছে।

ওয়ান পার্টির যুক্তিকতা :
যারা অপপ্রচারে লিপ্ত তারা ও জানে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা না থাকলে স্বৈরতন্ত্র হয়ে যায়। গণতন্ত্র সবসময়ই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থে প্রতিফলিত হয়ে আসছে। শাসক পার্টি কাদের স্বার্থে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এক দলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যে শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণি এবং বিভিন্ন শ্রেণির ও পেশার মানুষের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সমাজ প্রগতির মূলধারাকে শক্তিশালী ও

দুর্বার করতে পারে, শাসন তান্ত্রিক রীতি পদ্ধতির আওতায় সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক হবে সেটাই, যা বঙ্গবন্ধু ওয়ান পার্টি প্রবর্তনে, একক গণতান্ত্রিক দল গঠনের আওতায় ও এর সাংগঠনিক প্রক্রিয়াই ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মহান পথ নির্দেশ। বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন দর্শন ও সাধনার সর্বব্যাপী ঘটনা সমূহের মধ্যে একথা বিশ্বাসের কারণ রয়েছে যে, সমাজ প্রগতির বিপ্লবী ধারাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওতায় এক অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠুর রক্তপাতের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করতে গিয়েই তাঁকে রক্ত দিতে হয়েছে।

গণতান্ত্রিক নিয়ম তান্ত্রিক পথে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শত সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিকতার আইনানুগ পন্থা অনুসরণ এবং নিয়ম তান্ত্রিকতার ও আইনের শাসন প্রবর্তনের ভিতরে শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মতো জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের প্রজন্মের নিকট তাঁকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপসহীন অগ্রনী মহাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করবে।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁর প্রথম বিপ্লব এবং আর্থ সামাজিক মুক্তির লক্ষে ঘোষিত কর্মসূচিকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্দেশে প্রথম বিপ্লব বাঙ্গালী জাতি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাঙ্গালী জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) গঠন করেন। দ্বিতীয় বিপ্লব বাকশাল গঠনের নেপথ্যে যে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক নিহিত ছিল তার পটভূমিকা ও কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হলোঃ

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব এর কর্মসূচী :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রত্যাশা ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) গঠন তাঁর সেই কাঙ্খিত চেতনাকে বাস্তবে রূপদানের সাংগঠনিক কাঠামো দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বিশ্লেষণ বর্তমান প্রজন্মের জানা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দিক :
বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক লক্ষ নির্ধারণ করলেন, শোষণ মুক্ত সোনার বাংলা তৈরি, এই লক্ষ অর্জনের সাংগঠনিক রূপ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল।)

মৌল বিষয় হলো :
(১) জাতীয় ঐক্য
(২) শোষিতের গণতন্ত্র এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নির্বাচন পদ্ধতি।

(১) জাতীয় ঐক্য :
শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে জাতীয় ঐক্য নির্ধারণ করলেন। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে পশ্চাদপদ অবহেলিত বিশাল জনগোষ্ঠী এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, দল ও শক্তির সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনড়। তিনি বলেন, "জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য জাতীয় দল (বাকশাল) গঠন করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশকে ভালবাসেন এবং এর আদর্শ বিশ্বাস করেন, চার রাষ্ট্রীয় নীতি মানেন, সৎ পথে চলেন তারা সকলেই বাকশালের সদস্য হতে পারবেন। যাঁরা বিদেশি এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবেন। কারণ তাঁরাও জাতির একটা অংশ। তাদের অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যেখানে আছি একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।"

(২) শোষিতের গণতন্ত্র :
আমি চাই শোষিতের গণতন্ত্র, সমান্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশ বাদ ও সাম্রজ্যবাদের নির্মম শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সার্বিক মুক্তির লক্ষে নিপীড়িত বাঙ্গালী জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অব্যাহত সংগ্রাম করেছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ ও প্রেরণা ছিল পুরোনো পাকিস্তানি শাসন শোষণের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তে দুঃখী ও মেহনতি মানুষের রাজনীতি, গণ-মানুষের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শোষণমুক্ত সমাজ অপসংস্কৃতির পরিবর্তে নিজ দেশের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এর বাস্তবায়ন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলা গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু বলতেন, "আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র।"

শোষিতের গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বর্তমান গণতন্ত্রের স্বল্প আলোচনা অবশ্যক। বর্তমান গণতন্ত্রের উদ্ভব প্রাচীন গ্রীস দেশে। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতো নাগরিক বলে গণ্য হতো তারাই যারা অন্যের শ্রম ভোগ করে, শোষক, দাস-মালিক এবং অভিজাত শ্রেণি।

বঙ্গবন্ধু সকল বক্তৃতায় বলতেন "শোষিতের গণতন্ত্র" বলতে আমরা এমন এক গণতন্ত্রকে বুঝবো যা শোষিত মানুষের জন্য। তাদের স্বার্থে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ এক-স্পলয়েট করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী সেই শোষকদের অধিকার খর্ব করা হবে। শোষকদের সর্বপ্রকার শোষণের শোষিতের গণতন্ত্র বাতিল করে দেয়। শ্রেণির উর্ধ্বে কোনো গণতন্ত্র কখনো হয়নি। গণতন্ত্র বারবারই কোনো কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থে প্রতিফলিত করে আসছে। তাই শোষিতের গণতন্ত্রের প্রতিফলিত হবে। শোষিতদের মৌলিক রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার শোষিতের গণতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার গুলোকে বিভিন্ন ভাবে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, আর্থ-সামাজিক অধিকারঃ যেমন কাজের অধিকার, বিশ্রাম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার।
দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। যেমন, নির্বাচন বাক স্বাধীনতা প্রচারও প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার অধিকার।
তৃতীয়ত, বিবেকের স্বাধীনতাঃ ব্যক্তি স্বত্ত্বার প্রকাশ, ব্যক্তিগত চিঠি পত্রের গোপনীয়তা এবং চলাচলের স্বাধীন অধিকার সমূহ। শোষিতের গণতন্ত্রে এসব অধিকার এক সঙ্গে যুক্ত হয়, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব সমূহ।

শোষিতের গণন্ত্রের রাজনীতির :
বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানি রাজনীতি বুঝেননি যা হলো মুষ্টিমেয় শোষকদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করা। সেটা হতে পারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গণতন্ত্রের মোড়কে রাষ্ট্রপতি শাসিত বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত। আবার প্রয়োজন বোধে স্বশ্রেণি দলের বা সামরিক বাহিনীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

বুর্জোয়ারা বলে জীবিকা সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করো। অর্থনৈতিক পলিসি নেবে

তারা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বুঝতেন রাজনীতি, অর্থনীতি চালাবেন জনপ্রতিনিধি।

শোষিত গনতন্ত্রের রাজনীতি হবে উৎপাদন শক্তির বিকাশ সাধনঃ যারা মূল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি স্তরে গণপ্রশাসনে, আই-শৃঙ্খলা রক্ষায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বণ্টন এবং গণ-কল্যাণে দায়িত্ব পালন করবে। এর অর্থ জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তর হতে আমলাতন্ত্রের উৎখাত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন। বঙ্গবন্ধু চাচ্ছিলেন, ইডেন বিল্ডিং বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসন তান্ত্রিক ক্ষমতা ধরে রাখতে চাই না। আমি ক্রমান্বয়ে গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায় ও জেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুযোগ-সুবিধা পায়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রেসিডেন্ট হতে শুরু করে সংসদ সদস্য জেলা গভর্নর থানা প্রশাসক প্রতিস্তরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। এমন এক নির্বাচনী ব্যবস্থা যেখানে গরীব, দুঃখী, মেহনতী মানুষ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে, রাষ্ট্রের খরচে।

শোষিতের গণতন্ত্রের রাজনৈতিক কাঠামোঃ বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে নীচু তলা ও গ্রাম থেকে শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাজনীতি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পর্যন্ত বিকাশিত ও প্রশমিত থাকবে। যেখানে মধ্য স্বত্ত্বভোগী গ্রামীণ জোতদার, মহাজন, ধনিক ও বনিক শোষকদের স্থান থাকবে না। কারণ এ রাজনীতি থাকবে উৎপাদন শক্তির আওতায় শোষিত গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতায়ন অবাধ রাজনৈতিক অধিকার তথা ফ্রি স্টাইলকে বরদাস্ত করে না। কারন ব্যক্তি স্বাধীনতার অবাধ এই রাজনীতির নামে হাইজ্যাক, ডাকাতি, হানাহানি, শোষণ, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, ক্ষুধা দারিদ্র, মৃত্যু ও যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু এই রাজনীতিকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন "এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। কাপড় নেই, বন্ধু খুঁজে পায়না। যার বুকের হাড্ডি পর্যন্ত দেখা যায়, আমি জীবনভর এদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি, এদের পাশাপাশি রয়েছি, কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। তাদের দুঃখ দূর করার জন্য আমি শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা অর্থশালী, যারা ভোট কেনার জন্য টাকা পায়, তাদের গণতন্ত্র নয় শোষিতের গণতন্ত্র চাই।"

শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থনীতি

বঙ্গবন্ধু বলেন, "যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়। সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমে ব্যাংক, বীমা, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনিরকল, সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। এর অর্থ হলো শোষকগোষ্ঠী যাতে ঐ গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে।" শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থনীতি হলো রাষ্ট্রীয় খাতকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। ব্যক্তির পুঁজির বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা। উৎপাদনের উপায় সমূহকে সামাজিক মালিকানায় নিয়ে আসা। প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ করা। সামান্তবাদের অবশিষ্ট সমূহকে বিলুপ্ত করা। কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষে প্রাথমিকভাবে বহুমুখী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠিত করা। বহিঃব্যবসা, বাণিজ্য ও বিলি-বণ্টন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সোজা কথা বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক রূপ কাঠামো হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।

শোষিতের গণতন্ত্র :

সংস্কৃতি হলো প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাও ক্রিয়া কলাপের ভাবরূপ প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের সংস্কৃতির পেছনে কাজ করছে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারা। এ দু'ধারার সংমিশ্রনেই আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই পুরনো সংস্কৃতি শোষকের সংস্কৃতি, ব্যক্তি প্রাধান্য প্রবল। গণজীবনের অবিকৃত ও শানিত প্রকাশ সেখানে অনুপস্থিত। সেজন্য পুরনো সংস্কৃতিকে প্রত্যাখান করে নব-সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার লড়াই অনিবার্য। সেই দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের শক্তিশালী হাতিয়ার হলো শোষিতের গণতন্ত্র।

বাঙ্গালী সংস্কৃতি :

যার উদ্ভব হাজার বছর আগে রাজা-বাদশা ভূ-স্বামীদের প্রভাব যেমন সেখানে আছে, তেমনি আছে। গণ-মানুষের বেদনা মূর্ত বিক্ষোভ ও শ্রেণি ঘৃণা।

শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাওয়া :

এ লড়াই প্রাথমিক শর্ত হবে, যেমন বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, জনসাধারণের অনগ্রসরতা দূর, গণ-নিরক্ষতার বিলোপ সাধন, আবিশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন। অতীত সংস্কৃতির বিশ্লেষণ। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন এবং নব

সংস্কৃতির উদ্ভাধন। জাতির জনক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের সাথে সাংস্কৃতিক বিকাশের ও প্রয়োজনীয়তা আছে। এমন সংস্কৃতি যা দেশের নদ-নদী, জলবায়ু আবহাওয়া প্রকৃতি ও সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু আজ শোষকগোষ্ঠী সংস্কৃতিকে মুনাফা গড়ার স্বার্থে ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি দু'রকমের বিকৃতির শিকার। এ অবস্থা থেকে সংস্কৃতিকে উদ্ধার করতে হলে প্রয়োজন বৃহৎ গণপরিসরে সংস্কৃতির নবতর উদ্বোধন। এ শুভ উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজন শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হলো পুরনো জীবনাচারণ ও সামাজিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আগের চিন্তা ভাবধারা প্রতিক্রিয়া ও ধর্মান্ধতা হতে ব্যক্তি ও সমাজকে মুক্ত করতে নব-সংস্কৃতি হবে শানিত হাতিয়ার। এ সংস্কৃতি হবে জীবন্ত সজীব, মুক্ত, যুক্তি ভিত্তিক, প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক যার মূল শিকড় উৎপাদন শক্তির মানস ভুবনে প্রবর্তিত থাকবে। শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাই রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে সংস্কৃতিক লড়াই।

উপরোক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত ও প্রবর্তিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সংস্কৃতিক মুক্তির তথা শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপসহীন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

বাকশালের এর নির্বাচন পদ্ধতি :

গণতন্ত্রের মূল কথা দেশের মালিক জনগণ এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস। জনগণের এই ক্ষমতা রাষ্ট্র পরিচালনায় তার অংশ গ্রহণে অর্থাৎ অবাধ নিরপেক্ষ দুর্নীতি মুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তার মতামত প্রতিফলন করে থাকে। বঙ্গবন্ধু কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের কল্যাণে ও তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি মুক্ত সম-সুযোগ সম্বলিত বহু প্রার্থী ভিত্তিক অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রথা চালু করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বুর্জোয়া পার্লামেন্ট শুধু ধনী বিত্তশালী ব্যক্তিগণই সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাকশাল গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশে যে কটি উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে জাতীয় দলের পক্ষ হতে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ছিলেন বিত্তশালী, কেউ ছিলেন অপেক্ষাকৃত গরীব এবং কেউ বা ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তির

আর্শীবাদপুষ্ট। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, সরকারি খরচে সম-সুযোগে দুর্নীতি মুক্ত নির্বাচন প্রথায় সৎ ও খাঁটি চরিত্রের জনপ্রিয় প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা মহলের প্রাধান্য বা অর্থ কোনোটাই কাজে লাগেনি। সংগঠনে ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার মাধ্যমে সংগঠনের নিম্নতম থেকে উচ্চতর স্তর গুলিতে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হতে পারতেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বেলাও একাধিক ব্যক্তি বাকশাল হতে মনোনয়ন লাভ করতেন। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যেক প্রার্থী রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচনে সম-সুযোগ লাভ করতেন। এক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের স্বার্থে রক্ষাকারী ব্যক্তিই নির্বাচিত হতে পারতেন।

নতুন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। প্রত্যেক জেলায় একজন করে গভর্নর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই গভর্নর নির্বাচনের বেলায় ও বাকশাল হতে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হতো এবং একই পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। তাতে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হতেন। ফলে প্রসাশন, জাতীয় সংসদে এবং রাজনৈতিক সংগঠন (বাকশালে) প্রকৃতপক্ষে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত থাকতেন। এবং তাদেরই সার্বিক কল্যাণে কাজ করতেন। অনুরূপভাবে থানা পর্যায়ে প্রশাসন নির্বাচিত হতেন।

জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিকে ইসপিস (অভিশংসন) করতে অথবা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত করতে পারতেন। জাতীয় সংসদ সংবিধানের সংশোধনী, প্রশাসনিক কাঠামো ও সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনসহ যে কোনো আইন প্রনয়ন করার অধিকারী ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। দেখা যায় বাকশাল পদ্ধতিতে সংবিধান রাষ্ট্রপতি, সংগঠন জাতীয় সংসদ, গর্ভনর জেলা ও থানা প্রশাসনিক কাউন্সিল সব মিলিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলন করার ব্যবস্থা ছিল।

বাকশাল কর্মসূচীর অর্থনৈতিক দিক:

দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ বাস্তবায়নের জন্য বাকশাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঃ (১) **বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়:** গ্রামের

উন্নতি বাংলাদেশের উন্নতি, গ্রামের অর্থনৈতিক মুক্তি মানেই দেশের মুক্তি। তৎকালীন সময়ে দেশের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জমির যৌথ করণের কৌশল হিসেবে সমবায়ের কথা চিন্তা করলেন। প্রচলিত সমবায় নয়, বহুমুখী গ্রাম সমবায় এবং প্রয়োগের প্রয়োজনে তা বাধ্যতামূলক। প্রচলিত সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামাঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে উপড়িয়ে ফেলে কৃষি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমাবায় এর পরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধু বললেন "কো-অপারেটিভ আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই এবং এটা হবে কম্পলসারী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ।"

গ্রামীন ভূমি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা যেখানে হাজার বছর ধরে লালিত হয়েছে অবিচার, বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যায় ও উৎপীড়ন এবং শোষণ, ক্ষুধা দারিদ্র, ব্যাধি ও দুর্নীতি। যে সমাজের প্রক্রিয়াজাত ফলাফল সেই গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের লক্ষে বঙ্গবন্ধু তাঁর এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় গ্রামের কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতি, কামার-কুমার, মাঝি-মাল্লা, তথা দুঃখী মানুষের মুক্তির যে পথ নির্দেশ করলেন তা হল বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম-সমবায়। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত গ্রাম সমবায়ের মূল কথা, লক্ষ, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য চাষাবাদ ও ভূমি ব্যবস্থা। পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং এসবের সামগ্রিক ফলশ্রুতি কি তা আলোচনা করে দেখা যাক-

গ্রাম সমবায় :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গ্রামের কৃষিজীবী ও মেহনতী মানুষের মুক্তির লক্ষে বিভিন্ন ঘোষণা কৃষি বিষয়ক প্রস্তাব ও কার্যক্রমে বিশেষ করে বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম-সমবায় পরিকল্পনায় যে মূল্যবান মতামত পেশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-

(১) পাঁচশত হতে এক হাজার পরিবার নিয়ে এক বা একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে একটি পরকল্পিত গ্রাম গঠিত হবে এবং এ রকম প্রতিটি গ্রামে একটি করে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম-সমবায় গঠিত হবে।

(২) পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সকল গ্রামে উক্ত গ্রাম সমবায় গঠিত হবে।

(৩) জমির মালিকানা জমির মালিকদেরই থাকবে। কিন্তু চাষাবাদ হবে যৌথ

পদ্ধতিতে। উৎপাদিত ফসল বণ্টনে ও নিয়ন্ত্রনে তাদের অধিকার থাকবে। জমির মালিকদেরসহ তারাও গ্রাম-সমবায় এর সদস্য হতে পারবেন। গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা মূলত সমস্ত উৎপাদন শক্তির আওতায় থাকবে।

(৪) গ্রামীণ জীবনের সার্বিক বিষয় ক্রমান্বয়ে গ্রাম সমবায়ে নিয়ে আসা হবে। গ্রামে যে যে পেশা ও বৃত্তির লোক থাকবে সেই সেই বিভাগের সমবায় বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এর ব্যবস্থাধীনে গঠিত হবে। সব বিষয়ে ব্যাপক ও সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে।

(৫) সামন্তবাদ এর অবশেষ সমূহ বিলুপ্ত হবে। রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়কে সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবে। গ্রাম সমবায়কে রাষ্ট্রের প্রাথমিক সেল হিসাবে গড়ে তোলা হবে সর্বোতভাবে।

(৬) গ্রামের শোষিত মানুষকে সক্রিয় শক্তি হিসাবে গড়ে তুলে শোষিত গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অনিবার্য করা এবং সর্বস্তরে মেহনতী মানুষের মুক্তির লক্ষে শোষণহীন সমাজ গঠনের ভিত্তি ভূমি রচনা করা।

ভূমির পরিসংখ্যান :

তৎকালীন সময়ে বাংলাশের ভূমির পরিমান ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ একর। এর মধ্যে চাষ উপযোগী জমির পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর। কৃষির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৬২ জন ভূমীহীন কৃষক। শতকরা ১২ জনের হাতে আছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ কৃষি জমির প্রায় ৬০ ভাগ। আবার এই ১২ ভাগের মধ্যে ১.২ ভাগের হাতে আছে ৪৬ লক্ষ একর জমি। এরা ধনী কৃষক। এদের সংখ্যা সারা দেশে ১০ লক্ষর উপর। দেশের অবশিষ্ট শতকরা ৮৮ জনের অর্থ্যাৎ ৭ কোটির বেশীরভাগ লোকের হাতে আছে মাত্র ৯২ লক্ষ একর জমি। তাই শতকরা এই ৮৮ জন লোক নি:স্ব অন্ন বস্ত্রহীন অবস্থায় মানবেতার জীবন যাপন করে।

গ্রাম সমবায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(১) উৎপাদন বৃদ্ধি: উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় জমির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি। সমবায়ের মাধ্যমে যৌথ চাষাবাদ প্রচলন। যৌথ জীবনের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ বিকাশ। প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ-ব্যবহার।

(২) সুষম বণ্টন: সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের লক্ষে উৎপাদনের মৌলিক উৎস, উপায় উপকরণ ও সরঞ্জাম সমূহ ক্রমান্বয়ে গ্রাম-সমবায়ের

তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে এনে "কাজের পরিমান, শ্রম ও গুণ অনুযায়ী" সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।

(৩) কর্ম সংস্থান: চাষাবাদের ব্যাপক প্রচার ঘটিয়ে, বিভিন্ন উপায়ে বিকল্প কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে, সর্ববিধ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামের সকল কর্মক্ষম, মৌসুমী বেকারদের আধা বেকার কর্ম ও জীবিকা সংস্থানের সু-ব্যবস্থা করা।

(৪) উৎপাদন শক্তির বিকাশ: পরিকল্পিত জনসমষ্টি সৃষ্টি করে, মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরণ করার লক্ষ্যে প্রশাসন, বিচার বিভাগকে উৎপাদন শক্তির আওতায় নিয়ে আসা। শোষিত গণতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করে উৎপাদন শক্তিকে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার নির্মাতারূপে গড়ে তোলা।

(৫) গ্রামের সামগ্রীক উন্নয়ন: শহর ও গ্রামের পার্থক্য দূর করা, শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান করা। ক্রমান্বয়ে গ্রাম ও গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী করা। এজন্য কৃষি ছাড়াও কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও কুটির শিল্প, হাঁস, মুরগী, গবাদি পশু, মাছ শাক-সবজী, ফল-ফুল ও গাছ-গাছালির চাষ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, রাস্তা- ঘাট, সেচ বিদ্যুৎতায়ন, পুকুর খনন ও সংস্কার, জন স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা, প্রণালী এবং নতুন পল্লী নির্মাণ, গৃহায়ন বাজারজাতকরণ, ক্রেতা, বিপনন ও সরবরাহ ও ঋণ সমবায় গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগপৎ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামের সর্বাত্বক উন্নতি সাধন সুনিশ্চিত করা।

গ্রাম-সমবায় :

প্রাথমিক পদক্ষেপ ও স্থান নির্বাচন পদ্ধতি: জাতির জনক ঘোষণা করলেন, "ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেজন্য আমি কো-অপারেশনে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না, আমি জাম্প করার মানুষ নই, আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি।

আমি ইমপেশেন্ট হই না। আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজির নাজির জেনে কাজ করি। চুপি-চুপি আস্তে আস্তে মুভ করি বছরের সবকিছু নিয়ে। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। সেজন্য আমি বলে দিয়েছি এ বছর ৬০-৭০ বা ১০০টি কো-অপারেটিভ করব।"

তিনি বিভিন্নভাবে বলতেন, "আমি আমার প্রোগ্রাম করেছি, আমি নিজে ঠিক

করেছি আমার পদ্ধতি সিস্টেম যা হবে তা সবাইকে বলে দিতে হবে। একটা স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হব। ইনশাআল্লাহ তারপর আর কোনো অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিকেটর একটা কো-অপারেটিভ, এ মানুষ দেখে যে, এই দেশের এলাকার উপকার হয়েছে, তাহলে আপনার আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও, আমাদের ওটা করে দাও, আমাদের করে দাও।"

বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এর প্রাথমিক স্তরে স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু জেলা গভর্নরদের সুস্পষ্ট ভাবে বললেন, "আপনারা ৬১ জন জেলা গভর্নর যখন চার্জ নিয়ে যাবেন, দুই তিন মাসের মধ্যে জায়গা ঠিক করে একটি ভিলেজ ঠিক করে সব ব্যবস্থা করবেন। আমি এখন প্রোগ্রাম করছি। আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। সেটা করে এক একটা ডিস্ট্রীক্ট একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। প্রথমে এরিয়া ভাগ করে নেবেন। এমন জায়গা নেবেন, যেখানে আমি ইমিডিয়েটলি পাওয়ার দিতে পারি। ঐ কো-অপারেটিভ গুলিতে পাওয়ার দেব। ধরুণ যদি রাজশাহীতে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে যেখানে পাওয়ার দিতে পারি। এভাবে একটা, দুটো, তিনটে গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটি হবে কমপালসারী কো-অপারেটিভ। এতে কোন কিন্তু টিন্তু নাই।"

গ্রাম-সমবায় এর সংগঠন :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন "একটা, দুটো, তিনটা গ্রাম নিয়ে কো–অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রতিটি গ্রামে পাঁচশত থেকে যে এক হাজারের ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে।"

তিনি আরো বললেন, "প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অর্থ এই যে, বেকার প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভ সদস্য হতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণার কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাঁর ঘোষণা বিশ্লেষণ করে গ্রাম-সমবায় এর সাংগঠনিক কাঠামোর রূপ দাঁড় করানো যেতে পারে। গ্রাম সমবায় গঠনঃ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার অনুকূলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা অনুযায়ী একটি, দুটি বা তিনটি গ্রাম মিলিয়ে পাঁচশত হতে এক হাজার ফ্যামিলি নিয়ে এক একটি গ্রাম সমবায় গঠিত হবে।

সাধারণতঃ অর্থকরী ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় এলাকায়/চৌহদ্দী নিয়ে গ্রাম-সমবায় গঠন বাঞ্ছনীয়। গ্রাম সমবায় এর সদস্যঃ সমবায় এর নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তিই এর সদস্য হতে পারবেন। গরীব কৃষক, মধ্য ও ধনী কৃষক এবং ক্ষেতমজুর ভূমিহীন কৃষক সবাই গ্রাম সমবায় এর সদস্য হতে পারবেন। যদি তিনি সমিতির শর্তাদি মেনে চলেন এবং আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

গ্রাম সমবায় এর সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(১) জমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গ্রাম সমবায় কর্তৃক নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সকল সদস্য বাধ্য থাকবেন। (২) গ্রাম সমবায় এর সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি স্ব-স্ব কর্মক্ষমতা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চাষাবাদও অন্যান্য কাজ কর্মের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রয়োজনবোধ শ্রমদানে এবং বিশেষ প্রয়োজনে স্বেচ্ছা শ্রমদানে বাধ্য থাকবেন। (৩) উন্নত চাষাবাদ ও সামগ্রীক গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ব্যবহারিক ও কারিগরী জ্ঞান লাভের জন্য গ্রামের বাছাইকৃত সকল ব্যক্তিগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। (৪) রাজনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নত করণে গ্রাম সমবায়ের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। (৫) যে সব সদস্য/ব্যক্তি উপযুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন, তাঁর/তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে। উল্লেখ্য, চাষের জমির বিচ্ছিন্নতাহেতু কোনো ব্যাক্তি একাধিক গ্রাম সমবায়ের সদস্য হতে পারবেন। কিন্তু একাধিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা হতে পারবেন না।

ব্যবস্থাপনা কমিটি :

গ্রাম সমবায় পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে এবং এর সদস্য সংখ্যা ২১ জনের বেশি হবে না। এর সাধারণ সভ্য কর্তৃক শ্রেণি ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। সদস্যগণকে নিম্ন লিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হবে-

(১) ভূমিহীন কৃষক: ক্ষেত মজুর।
(২) গরীব কৃষক: অর্ধবিঘা হতে ৮ বিঘা জমির মালিক।
(৩) মধ্য কৃষক: ৯ বিঘা হতে ২৫ বিঘার কম জমির মালিক।
(৪) ধনী কৃষক: ২৫ বিঘা ও তার অধিক জমির মালিক।
(৫) বুদ্ধিজীবী এবং পেশাজীবী জেলে, কামার কুমার ইত্যাদি।

কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হতে একজন সভাপতি নির্বাচিত করবেন। কমিটি সভ্যদের নিয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

কমিটি যৌথ নেতৃত্বে ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করবে। প্রত্যেক ফসল বোনার মওশুম শুরু হবার আগের আবহাওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাষ্ট্রের নির্দেশ, সদস্যদের চাহিদা ও মানসিকতা এবং বাস্তব অবস্থা পরিমাপ করে কমিটি উৎপাদনের পরিকল্পনা তৈরি করবে। উক্ত খসড়া পরিকল্পনা পূর্ণ আলোচনার জন্য সদস্যদের কাছে দেওয়া হবে। তারপর বিভিন্ন পরামর্শ বা প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর খসড়াগুলো চূড়ান্ত করা হবে। আলোচনায় যোগ দেওয়া, পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয় অনুমোদন এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে তাতে অংশ গ্রহণ এবং তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করা গ্রাম কমিটির এবং প্রত্যেক সদস্যের অধিকার ও কর্তব্য। কমিটির প্রধান কাজ হল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপায়ে সদস্যদের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা। কমিটি বিভিন্ন উৎপাদন এবং সমবায় ইউনিট সমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ছাঁটাই ও প্রমোশন দিতে পারবে। সাধারণত কর্মকর্তা কর্মচারি গ্রাম সমবায়ের লোক হতে হবে।

কমিটি এসব বিভিন্ন কাজে নের্তত্ব দিবে, তদারকি করবে এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজবোধে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে।

কমিটি সাধারণ পরিষোধের সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং তার ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করবে। কমিটি ব্যধ্যতামূলক গ্রাম সমবায় এর মূলনীতি লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব যা বর্ণিত রয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাবে। কমিটির পক্ষে সভাপতি সমস্ত দৈনন্দিন কার্যে নেতৃত্ব দেবে।

উৎপাদন বিগ্রেড :

কমিটির প্রত্যেক সদস্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক বা একাধিক বিভাগ/ক্ষেত্রে পরিচালনার সক্রিয় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। এসব পরিচালকের নেতৃত্বে গ্রামের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে পেশা/ক্ষেত্র/বিভাগ ভিত্তিক উৎপাদনী বিগ্রেড থাকবে। উৎপাদনী বিগ্রেড হবে অকৃষি/কৃষি শ্রমিকদের এমন একটি সমবেত দল, যারা নিয়মিত ভাবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট উৎপাদন উপায়ের সাহায্যে সমবায় খামারে বা অন্যত্র এক একটা শাখায় উৎপন্ন দ্রব্য না পাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করে। সারা বছর বিগ্রেডকে সমানভাবে কাজ যোগানের জন্য

একের পরিবর্তে অন্য শাখায় কাজ দেওয়া যেতে পারে। এভাবে বিগ্রেডের শ্রমদিন ও শক্তি বাড়ানো যাবে। ব্যবস্থপনা কমিটি ঠিক করে দেয় বিগ্রেডে কারা কারা থাকবে। যদি বিগ্রেড শস্য উৎপাাদনের কাজ করে তাহলে সেই বিগ্রেড অবশ্যই থাকবে এমন লোক যারা জমি চাষ করতে পারে, ফসল বুনতে পারে এবং ফসল তোলা প্রভৃতি সমস্ত কাজ করতে পারে। আর যদি বিগ্রেড বস্ত্র উৎপাদন করে তবে সেখানে থাকবে সেই কাজের জন্য বিজ্ঞ ও যোগ্য লোক। প্রয়োজনবোধে বিগ্রেড উপ দলে বিভক্ত হতে পারে। গ্রামে কৃষি ব্যতীত যে সব অন্য মূল পেশায় নিয়োজিত সদস্য সংখ্যা দশ জনের অধিক সে সব ক্ষেত্রে পেশা ভিত্তিক উৎপাদনী বিগ্রেড থাকবে এবং এসব বিগ্রেড ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

এছাড়া কাজ থাকছে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা সম্পর্কে গ্রামের জনগকে সচেতন করা। তাদের পুরনো মনোবৃত্তি ঢেলে সাজাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা এবং সমাজতান্ত্রিক নতুন পল্লী গঠনের অগ্রণী ও দক্ষ নির্মাতা রূপে গড়ে তোলা ব্যক্তিবাদী একজন কৃষককে সমষ্টিবাদী করে তোলা। সমাজতন্ত্রের আদর্শে এক নতুন জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার সক্রিয় নির্মাতায় রূপান্তরিত করা এক দুরূহ কাজ। আর কমিটির স্বার্থকতা হল এই দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করার ভেতরে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব :

গ্রাম কমিটির দায়িত্ব হল, গ্রামের কৃষি, কৃষক ও গ্রাম জীবনের সার্বিক মান উন্নয়ন, এর বিশেষ দায়িত্ব হল জমির রেকর্ড, জমির ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা বেকারত্ব দূর করা শ্রম শক্তির সুষ্ঠু ও সার্বিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা করা এছাড়া গ্রাম কমিটির দায়িত্ব থাকছে।

(১) সমবায়: গ্রামে যে যে বৃত্তির ও পেশার লোক আছে। গ্রাম সমবায় সেই সেই বিভাগ গঠন। উৎপাদনের স্বার্থে ক্রেতা সরবরাহ বিপণন এবং ঋণদানের মতো সরল সমবায় গঠন।

(২) হাঁস মুরগীর চাষ: দেশি হাঁস মুরগীর বদলে উন্নত জাতের হাঁস মুরগীর চাষ ও তার সংখ্যা বাড়ানো। প্রথম অবস্থায় প্রতি বাড়িতে চাষ পরবর্তী কালে স্থান ভিত্তিক সমবায় খামার গড়ে তোলা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা :

(৩) গবাদী পশু পালন ও প্রজনন: উন্নতজাতের ষাড় আনয়ন, কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করা সমবায়ের মাধ্যমে উন্নতজাতের গাভী সরবরাহ এবং পরবর্তী কালে সমবায় ভিত্তিক পশু খামার গঠন, গবেষণা এবং চিকিৎসা।

(৪) মাছ চাষ: নদী, পুকুর, খাল, বিল ও জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাপক মাছ চাষের ব্যবস্থা করা জেলে সমবায় গঠন।

(৫) বৃক্ষ রোপন ও হার্টি কালচার: ফল চাষ, উদ্যান সৃষ্টি, নার্সারী স্থাপন এবং হার্টি কালচার ব্যাপক বনায়ন।

(৬) কুটির শিল্প: কুটির শিল্পের সমবায়করন ও সম্প্রসারণ, তাঁত শিল্পের সমবায়করণ ও আধুনিকীকরণ, কৃষি নির্ভর শিল্পকলা, আলু, কাঁঠাল, আনারস, ডিম, মাছ, মাংশ ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প স্থাপন, ধান ভাঙ্গানো হিমাগার, তেলের কল ইত্যাদি স্থাপন।

(৭) শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও নারী শিক্ষা, বৃত্তি মূলক শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিং ক্লাব ও সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক শিক্ষা, সংগঠন।

(৮) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা: সুষম ও পরিমিত খাদ্য গতানুগতিক খাদ্যভ্যাস পরিবর্তন, স্বাস্থ্যকর ও রুচি সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিকার ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা, ছোট পরিবার গঠন এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করা।

(৯) ফিজিক্যাল প্লানিং: গৃহ ও গ্রাম পরিকল্পনা বর্তমান প্রতিটি গ্রামই অগোছালো। বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট অবিন্যস্ত। সেজন্য প্রয়োজন ফিজিক্যাল প্লানিং এর গ্রাম চাষাবাদের জমি রাস্তাঘাট, নদী-নালা গাছ-পালা, বাগান, ঘরবাড়ি, গোয়াল ঘর, হাঁস-মুরগীর ঘর ইত্যাদি সুবিন্যস্ত করা। স্বল্প খরচে সুবিন্যাস্তভাবে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা। পরিকল্পিত উপায়ে গ্রামের পূর্ণগঠন করা যাতে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানীয় জল, রাস্তা-ঘাট, বাজার, বন্দর বিদ্যায়তন, খেলা-ধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা গ্রামের প্রতিটি মানুষ গ্রহণ করতে পারে।

(১০) রাস্তাঘাট এবং যানবাহন: পুরাতন রাস্তা সংস্কার, পরিকল্পিত নতুন রাস্তা এবং পাকা রাস্তা নির্মাণ সমবায়ের মাধ্যমে রিকসা স্কুটার বাস, ট্রাক ও নৌকার যান্ত্রিকরনের ব্যবস্থা করা, সুবিন্যস্ত ও নিরাপদ বন্দর স্থাপন।

(১১) উৎপাদিত দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও বাজার জাতকরণ: গ্রামে সাধারণ গুদাম ও হিমাগার তৈরি সমবায় গঠনের মাধ্যমে বাজারজাত করনের ব্যবস্থা করা।

(১২) বিদ্যুৎ পানীয় জলাশয় এবং পয় প্রণালী: প্রথম স্তরে বিদ্যুৎ দিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি শিল্প ও হিমাগার গড়ে তোলা, দ্বিতীয় স্তরে ছোট ছোট তাঁত বিদ্যুতিকরন ও যান্ত্রিকীকরণ কুটির শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবস্থার এবং তৃতীয় স্তরে পরিকল্পিত গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবহার। গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও বিজ্ঞানভিত্তিক পয়ঃপ্রণালী স্থাপন।

(১৩) বীমা ও সামাজিক বিষয় দুর্যোগকালীন শস্য বীমা: গ্রুপ বীমা, অবকাশ যাপন এবং সবেতন কুটির ব্যবস্থা করা।

(১৪) ব্যবস্থাপনা কমিটি: এছাড়াও ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বে থাকবে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে তোলা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গ্রাম্য সালিশী প্রবর্তন এবং সঠিক গ্রাম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা সেল গঠন। মোট কথা, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সেল হিসেবে গ্রাম সমবায় এর সার্বিক দায়িত্ব গ্রাম কমিটি পালন করবেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকাল

কমিটির আয়ুষ্কাল সাধারণত এক শস্য বছর হবে। গ্রাম সমবায় তহবিল: প্রত্যেক গ্রাম সমবায় এর তহবিল ব্যাংকে একাউন্ট বন্ধ থাকবে। কমিটির অনুমোদনক্রমে সভাপতি এবং সচিব কোষাধ্যক্ষ তহবিল পরিচালনা করবে। সাধারণ তহবিল, মূলধন, উন্নয়ন ও কল্যাণ তহবিল এবং সংরক্ষিত তহবিল নামে কয়েকটি অর্থ তহবিল থাকবে।

সাধারণ পরিষদ :

গ্রাম সমবায়ের সকল সদস্য নিয়ে একটি সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। বছরে একবার কিংবা সম্ভব হলে একাধিক প্রতি প্রধান ফসলের পর পর এ পরিষদের অধিবেশন হতে হবে। বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম সর্বোচ্চ সংস্থা হলো তার সাধারণ পরিষদ। সাধারণ পরিষদে গ্রাম কমিটির নির্বাচন কার্যপরিচালনার জন্য নিয়মাবলি এবং প্রচলিত নিয়মের সংশোধন করতে পারবে। উৎপাদন ও ফিনান্স সংক্রান্ত বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ, আয় ব্যয়ের ও পরিকল্পিত বাজেট অনুমোদন, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জরুরি প্রশ্নে সাধারণ পরিষদ বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফিনান্স ও উৎপাদন ঘাটতি সমস্ত কার্যকলাপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সাধারণ পরিষদ "অডিটিং ও মূল্যায়ন কমিটি" নির্বাচিত করবে। একমিটি অন্যান্য কাজ ছাড়াও পরীক্ষা করবে সভ্যদের শ্রম মুজরীতে কত খরচ হয়েছে। সমবায়ের ফসল ও অর্থ হিসেবের খাতায় ঠিক মতো উঠছে কিনা এবং সমবায়ের সম্পত্তি কিভাবে রক্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে গ্রাম সমবায় এর কীরকম লেনদেন হচ্ছে। ঋণ ও প্রাপ্য আদায় কীভাবে হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাভূক্ত অন্যান্য ইউনিট সমূহের আন্ত:অর্থনৈতিক সম্পর্ক কেমন ইত্যাদি বিষয়ে অডিটিং ও মূল্যায়ন কমিটি নিরীক্ষা চালাবে এবং এ সমস্ত বিষয়ের ফলাফল সাধারণ সভায় অবগতি এবং অনুমোদরে জন্য দলিল আকারে পেশ করবে। উক্ত কমিটি সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী।

গ্রাম সমবায় ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদি :

১। গ্রাম সমবায় এর এলাকাভূক্ত চাষের জমি ও মাছ চাষের যোগ্য পুকুর, ডোবা, খাল ও বিল ইত্যাদি সমবায়ের সাধারণ তদারকিতে সমন্বিত চাষাদের আওতাভূক্ত বলে গণ্য হবে। বসত বাড়ি সংলগ্ন ও চৌহদ্দির মধ্যে, ভিটা, পুকুর, সবজীবাগান, মসজিদ, গোরস্থান, মন্দির ইত্যাদি মালিকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে।

২। মালিকের স্বত্ব থাকবে, প্রচলিত উত্তরাধিকার ও ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন বলবৎ থাকবে। তবে সমবায় এলাকায় চাষের জমি হস্তান্তরে গ্রাম সমবায় এর দাবি অগ্রগণ্য থাকবে অথবা এর অনুমতি নিতে হবে।

৩। গ্রাম সমবায় এলাকার মধ্যে উপস্থিত হাট-বাজার, খাস পুকুর, জলাশয়, খাস জমি অনাগরিক সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি সমবায়ের বন্দোবস্তে ও ব্যবস্থাপনায় থাকবে।

৪। যেসব গ্রাম বা গ্রাম সমূহের এলাকা নিয়ে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় গঠিত হবে। সেসব এলাকার জমির বর্তমান মালিকানা, উত্তরাধিকার ও দখল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ড ও ম্যাপ তৈরি এবং পুরাতন রেকর্ড পুণর্বিন্যাস ও নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৫। জমির চাষাবাদ হবে যৌথভাবে। উক্ত চাষাবাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দাগের বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষুদ্রতা দূরীকরনের জন্য এবং সমিতির সদস্য ও সন্নিহিত গ্রামের ভূমিমালিকদের বাধ্যতামূলকভাবে জমির এওয়াজ বদল করিয়ে জমি একীকরণ করার জন্য আইন ও বিধিগত ব্যবস্থা থাকবে।

৬। বাধ্যতা মূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এর ফলশ্রুতিতে সামন্তবাদের অবশেষ সমূহ যেমন বর্গাচাষি ভাগ চাষি অধিক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত ঘোষিত হবে।

৭। অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের বৃদ্ধও অসমর্থ মালিকদের জমিচাষের দায়িত্ব গ্রাম সমবায়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৮। স্বত্ব, দখল, রেকর্ড সংক্রান্ত সকল বিরোধীয় জমি গ্রাম সমবায় এর সরাসরি চাষে আনা হবে। উক্ত জমির ফসলের মালিকানা, অংশ সমবায়ের সংরক্ষিত তহবিলে জমা থাকবে।

গ্রাম সমবায় এর জন্য সুযোগ সুবিধা ও রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব :

১। গ্রাম সমবায় গঠিত হবার পর পরই নিম্নলিখিত স্থায়ী সুবিধাদি অনুদান হিসেবে প্রদান করবে ঃ

(ক) সমিতির অফিস ঘর। (খ) গুদাম ঘর। (গ) মাড়াই এর জন্য উঠান (পাকা)

২। নিম্ন লিখিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন মত রাষ্ট্র সরবরাহ করবে-

(ক) ট্রাকটর/টিলার (খ) লাঙ্গল টানার বলদ ও প্রচলিত অন্যান্য যন্ত্র (গ) গভীর নলকুপ বা শক্তি চালিত পাম্প (ঘ) স্প্রে মেশিন (ঙ) বীজ পরীক্ষার যন্ত্র (চ) লেভেলিং যন্ত্র (ছ) মাটি পরীক্ষার যন্ত্র (জ) এবং প্রয়োজন মতন অন্যান্য যন্ত্রাদি।

কৃষি কাজের জন্য রাষ্ট্র নিম্নলিখিত উপকরণ সমূহ সরবরাহের ব্যবস্থা করবে-

(ক) সারঃ জৈব সার গোবর, কম্পোস্ট অন্যান্য সার। গ্রামের বাড়ি নির্দেশ মত তৈরি করতে হবে। রাসায়নিক সারঃ প্রত্যেক ফসলের প্রারম্ভে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ করবে এব্যাপারে গ্রাম সমবায় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে।

খ) বীজঃ প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি উন্নয়ন সংস্থায় প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করবে। পরবর্তী কালে নিজস্ব প্রয়োজনীয় বীজ গ্রাম সমবায় খামার হতে উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। এজন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক ব্যবস্থাদির সহায়তা করবে।

গ) কীটনাশক ঔষধঃ প্রয়োজনীয় কীট নাশক ঔষধ রাষ্ট্র যথা সময়ে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। গ্রাম সমবায় এ ব্যাপারে এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে।

৪। সেচঃ জল সেচের জন্য পাম্প বা নলকূপ প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্র সরবরাহ করবে এবং এসবের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে। পরবর্তী কালে অবশ্য গ্রাম সমবায় নিজেরাই এসবের ব্যবস্থা করবে এবং ব্যয়ভার বহন করবে।

৫। সম্প্রসারণঃ কৃষি বিভাগ প্রতি গ্রাম সমবায় এ কৃষিকর্মী ও বিশেষজ্ঞ পাঠাবে। যারা বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের পাশে থেকে পরামর্শ ও সহায়তা দেবে এবং সম্প্রসারণ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৬। সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থাঃ বছরের আকাল মাসগুলোতে (যথাঃ চৈত্র-বৈশাখ ভাদ্র আশ্বিন-কার্তিক) যখন গ্রামাঞ্চলে নিদারুণ খাদ্য অভাব বিরাজ করে। তখনই সাধারণত, প্রধান ফসলের চাষাবাদ ও বুননের সময়। ফলে কৃষকেরা এক ভয়বহ অবস্থায় পতিত হয় এবং সক্রিয় ও সুষ্ঠুভাবে চাষাবাদ করতে পারে না । এ নাজুক অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ফসলী মৌসুমে প্রতিটি গ্রাম-সমবায় এ রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করবে এবং ফসল কাটার পর এ ঋণ আদায় করে দেবে।

৭) প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্র ক্যাডার মিলিশিয়া ও বিশেষজ্ঞ প্রেরন করবে। তারা পরিকল্পনা, উৎপাদন আইন শৃঙ্খলা ও বিচার সালিসে ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করবে। বঙ্গবন্ধু গ্রাম সমবায়কে রাষ্ট্রীয় ঋণ, অনুদান, সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যপক কার্য ক্রম গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম সমবায় এর জন্য তিনি দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ছিলেন।

গ্রাম-সমবায় এর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও বণ্টন ব্যবস্থা :

চাষ হল কৃষির অন্যতম শাখা। চাষ মানুষকে জোগায় খাদ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল। চাষের সাহায্যে তৈরি হয় পশু খাদ্য, যা না হলে পশু পালন অসম্ভব হয়ে উঠে। চাষ তাই কৃষি কাজের প্রধান ভিত্তি। বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানা চাষ হয়। এখানে চাষের জমি খণ্ড ক্ষুদ্র। এই খণ্ড ক্ষুদ্র জমি আবার আইল দ্বারা সীমায়িত।

বাংলাদেশের জমির আইল এর সমষ্টি ফল আয়তনে প্রায় একটি জেলার সমান। অথচ চাষের কাজের জন্য প্রয়োজন জমির পূর্ণ সদ্ব্যব্যবহার।

বঙ্গবন্ধু জমিকে ব্যক্তি মালিকানায় রাখার গ্যারান্টি দিয়ে যৌথ সমবায়ী চাষাবাদের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেন। যে সব গ্রাম নিয়ে বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায় গঠিত হবে, সেসব গ্রামের সমস্ত জমিতে যৌথ চাষাবাদ চলবে । আইল তুলে দেয়া হবে। সেচ কাজের সুবিধার জন্য ড্রেন কাটা হবে। যে মালিকের যতটুকু জমির উপর দিয়ে ড্রেন যাবে তিনিও সেটুকু জমির ফসলের ভাগ পাবেন। সমস্ত জমির উৎপাদন গড়পরতা হারে আইল তুলে দিলে যে উল্লেখযোগ্য জমি পাওয়া যাবে তা সমবায়ের সম্পত্তিতে পরিগণিত হবে। বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত চাষাবাদ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এতে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের সমবায়ী মালিকানার অংশীদারিত্ব থাকবে। সমবায়ী যৌথ চাষাবাদের ফলে: (ক) আইল তুলে দেবার ফলে বাড়তি জমি পাওয়া যাবে।
(খ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করা যাবে।
(গ) উৎপাদন ব্যয়হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কেননা আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো জমিতে যেখানে লাঙ্গল লাগছে দশখানা, সেখানে সমবায়ী যৌথ চাষে লাঙ্গল লাগবে সাত খানা। কেননা সেখানে জমি ক্ষুদ্র খণ্ড অংশে বিভক্ত থাকে না, ফলে আধুনিক পদ্ধতির সুযোগ সুফল গ্রহণ সম্ভব পর হয়ে উঠে। এই বাধ্যতামূলক যৌথ সমবায়ী চাষাবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঘাটতি ও রুগ্ন গ্রামীন অর্থনীতিকে সচল উদ্বৃত্ত উৎপাদনে পরিণত করা সম্ভব।

সেজন্য বঙ্গবন্ধু বলতেন, "আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়। জাপানে এক একর জমিতে তার তিন গুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল ফলাতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারবো না?"

অন্যত্র তিনি বললেন, "পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না, এসব বলে বসে না থেকে জনগনকে মবিলাইজ করুন। যেখানে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। দরকার হয় কুয়া কেটে পানি আনুন। আমাদের দেশে ছয় হাত, সাত হাত, আট হাত কুয়া কাটলেই পানি ওঠে থাকে সেখানে ফসল করার জন্য চিন্তার কী আছে।" তিনি আরো বললেন, "আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্ট একটু হাফ প্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।"

বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি যদি খাদ্য দ্বিগুণ করতে পারি, তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ভিক্ষা করতে হবে না। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা হতে চাই না। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভায়ের কাছে, যারা সত্যি কার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছে ও চাই জমিতে যেতে হবে। ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে ঐ শহীদের কথা স্মরণ করে, ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইন্‌শাআল্লাহ হবে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পাঁয়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে।"

কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে চাইলে বা ফসল ডবল করতে চাইলেই তা হয় না। প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থায় উৎপাদন উপকরণ বহাল রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সেজন্য বঙ্গবন্ধু প্রথমেই ভূমি ব্যবস্থার পুর্ণগঠনে হাত দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি আমলের পরিবার প্রতি ৩৭৫ বিঘার স্থলে জমির সিলিং ১০০ বিঘায় কমিয়ে আনলেন। তিনি বললেন, "আস্তে আস্তে যদি ফ্লাড বন্ধ করতে পারি। সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, ফার্টিলাইজার দিতে পারি, নিশ্চয় আমরা চিন্তা করব, আরো কতদূর কী করতে পারি।" কিন্তু শুধু মাত্র জমির সিলিং কমিয়ে আনলেই সমস্ত ভূমি সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন, ক্ষেত মজুরদের সংখ্যা তুলনায় অপ্রতুল।

মূলত এসব প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার আংশিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু সার্বিক সমস্যার সমাধান এতে নেই। বাংলাদেশ বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। কিন্তু ভূমিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রেখে সেই

পরিবর্তনকে কিভাবে সম্ভবপর করা যেতে পারে?

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ভূমির জাতীয়করণ বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না। তাই জমিতে মেহনতী কৃষকের মালিকানা বজায় রেখে সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে যৌথ চাষাবাদে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন। উৎপাদন ও বণ্টনে ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষির আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছিল। সেজন্য উৎপাদিত ফসলে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সমবায়ী মালিকানা অর্জিত হয়েছিল। এমনি করে চির অবহেলিত ক্ষুধা দারিদ্র্য, রোগে অসহায় লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষকে উৎপাদনে সচল অংশীদারিত্বে এবং সবল উৎপাদনশক্তি রূপে জাতির জনক গঠন করতে চেয়েছিলেন।

এই লক্ষ লক্ষ অভুক্ত, আধা পেটা খাওয়া মানুষগুলো নিজেদের স্বার্থেই উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কেননা বেশি উৎপাদন বেশি করে খাবার দিবে, দেবে নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

বণ্টন ব্যবস্থা :

উৎপাদিত ফসল বন্টনে ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর এবং গরীব চাষীদের অধিকারের কথা জাতির জনক ঘোষণা করলেন, "জমির মালিকের জমি থাকবে-কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাঁকে কো-অপারেটিভ এর সদস্য হতে হবে। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে উৎপাদিত ফসল বণ্টন হবে।"

উৎপাদন খরচের ধরা হবে :

(১) বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম।

(২) উৎপাদনের মূল উপায় গুলোর মধ্যে যথা, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, কাস্তে, কোদাল এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ক্ষয়, তার মূল্য, বদলি ও চলতি মেরামত ইত্যাদির ডিপ্রিসিয়েশন বাবদ খরচ।

(৩) উৎপাদন ব্যবহার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কৃষি শ্রমিকদের মজুরী মাসিক বেতন ইত্যাদির খরচ।

(৪) ব্যবস্থাপনা খাতের খরচ। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও ঋণ নেয়া ও পরিশোধের খরচ।

(৫) ফসল সংরক্ষণ এবং বিক্রি করার কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সব খরচাদি উৎপাদিত ফসলের ভাগ বণ্টনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নরের হাতে। সুতরাং উৎপাদন খরচ বাদে উৎপাদিত ফসল তিন

ভাগে বিভক্ত হবে”

(ক) জমির মালিকের অংশ :
জমির মালিকগণ জমিতে কাজ করলে রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন। তাছাড়া তারা সমবায় অংশের বোনাস পাবেন। বণ্টন নীতি হবে সমাজতান্ত্রিক

(খ) সরকারের অংশ :
উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে সরকার উৎপাদিত ফসলের শতকরা ৫ ভাগ হারে একক কর হিসেবে নিতে পারবেন। গ্রামের উপর অন্য কোনো প্রকার সরকারি ট্যাক্স বা খাজনা থাকবে না। বর্তমানের উন্নয়ন ট্যাক্স, চৌকিদারী ট্যাক্স, জমির খাজনাসহ গ্রামের মানুষের উপর সর্বপ্রকার ট্যাক্সের বিলুপ্তি ঘটবে। বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় হাতে রাষ্ট্র যে ট্যাক্স নেবে রাষ্ট্রের সাহায্যের তুলনায় তা নগণ্য। কেননা, রাষ্ট্র সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎতায়ন, কম মূল্যে সরবরাহ করে। কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ। রাষ্ট্র পরিচালনা করে স্থল, হাসপাতাল, উৎপাদন ও শিল্প স্থাপনের জন্য দেবে বিশেজ্ঞ পরামর্শ। এমনি করে রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রাম সমবায় এর বোঝা কমিয়ে বণ্টন আয়ের পথ বাড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনে রাষ্ট্র ধার্যকৃত মূল্যে ফসল কিনে নেয় এবং ন্যায্য মূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করে। রাষ্ট্র যে ৫ ভাগ নেয় তা বেশি নয়। শের-শাহের আমলে ২৫ ভাগ, পাল আমলে ১৬ ভাগ নিতো রাষ্ট্র।

(গ) সমবায় অংশের দু'টি ভাগ থাকছে-
(১) উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মকাণ্ড
(২) সদস্যদের মধ্যে বোনাস বণ্টন

(১) উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মকাণ্ড :
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র, বাসস্থানের মত বিরাট সব কর্মকাণ্ড এস্তরে থাকছে, থাকছে গ্রামীণ উন্নয়নের সব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। কেননা, বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায় শুধু মাত্র ব্যক্তি স্বার্থকেই দেখবে না, দেখবে তার সাথে সাথে সামাজিক স্বার্থ। গ্রাম সমবায় এলাকার আওতায় কর্ম ক্ষমতাহীন ব্যক্তি, অনাথ ও বিধবা যাদের জীবিকা সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই তাদের ভরণ পোষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকবে। অবশ্য উন্নয়ন এবং সামাজিক বিরাট কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় সেবা সাহায্য সহযোগিতা ও অনুদান ইত্যাদি যুক্ত হবে।

(২) সদস্যদের মধ্যে বোনাস বণ্টন :

উপরের উন্নয়ন মূলক ও সামাজিক কার্যক্রমে সমবায় এর অংশ এমনভাবে বরাদ্দকৃত করতে হবে যেন সদস্যদের বোনাস সংকুচিত না হয়, তারা যেন কাজ করতে উৎসাহ হারিয়ে না ফেলে। সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে আলোচনা করে এবং তাদের অনুমোদন নিয়ে এ সমস্ত কাজ কর্মে অর্থ বরাদ্দ করত হবে। সদস্যদের স্বার্থ উপেক্ষা করে নয়। প্রতিটি সদস্য সমভাবে বার্ষিক বোনাস পাবে অথবা বোনাসের অনুরূপ টাকা তারা মালিক ভাতা হিসেবে নিতে পারবেন।

ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষী :

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এ গ্রামের সবাই কম বেশি উপকৃত হবেন। বেশী উপকৃত হবেন তুলনামূলক ভাবে ভূমিহীন, ক্ষেত মজুরও গরীব চাষী, কেননা এরাই গ্রাম সমবায়কে পরিচালনা করবে তাদের স্বার্থে।

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়ে যেসব সদস্য জমির উপর কাজ করবেন "তারা কাজের পরিমান গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী" পারিশ্রমিক পাবেন। গরীব কৃষক পাচ্ছেন জমির মালিকানা হিসেবে ফসলের অংশ পাচ্ছেন। পাচ্ছেন জমিতে কাজ করার জন্য নিয়মিত পারিশ্রমিক। পাবেন সমবায়ের অংশের ভাগ। ভূমিহীন কৃষক ক্ষেত মজুর পূর্বে যাদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিলনা তারা পাচ্ছেন বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কাজ। কাজের এবং জীবিকার সাথে গ্রাম সমবায় এদরে দেবেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্যের ন্যুনতম গ্যারান্টি। পাচ্ছেন মাসিক বেতন, ভাতা, চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধাসহ সবেতন ছুটি, পাচ্ছেন গ্রামে রাষ্ট্র প্রদত্ত অন্যান্য আধুনিক উপকরণের সুবিধা সমূহ। এছাড়াও তারা পাচ্ছেন অংশের ফসল বা টাকা।

গ্রাম সমবায়ের আওতাধীন কার্যক্রম ও দায়িত্ব :

উৎপাদককে মূল শক্তি হিসেবে ধরে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার অর্থনীতি হল বঙ্গবন্ধুর বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এর বাস্তবায়ন কৌশল। বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রধানত কৃষি উৎপাদনের জন্য হলেও এ শুধু উৎপাদন আর লাগোয়া অর্থনীতিকেই সংগঠিত করে না স্থানীয় ভাবে উন্নয়ন ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে। এ সমবায় এক দিকে যেমন বন, ফল, চাষ, মাছ, হাঁস মুরগী গবাদী পশু পালন এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্য দিকে তেমনি কৃষিজ শিল্প স্থাপন, যোগাযোগ পরিবহন ক্রেতা সমবায় বাণিজ্য, বিপণন ও বাজারজাতকরণ সমবায় অন্ন, বস্ত্র,

শিক্ষা, বাসস্থান ও সাংস্কৃতির মৌলিক চাহিদার কাজগুলো, আইন শৃঙ্খলার জন্য মিলিশিয়া পরিচালনা এবং গ্রাম-সালিশীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও করে থাকে। এক কথায়, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা, বিচার প্রশাসন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়। শোষিতের গণতন্ত্র ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত গ্রাম সমবায় হচ্ছে এক ধরনের বৈপ্লবিক গ্রাম-সংগঠন।

গ্রাম সমবায় এর ফলশ্রুতি :

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত গ্রাম-সমবায় এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে বাড়তি উৎপাদন হতো সন্দেহ নেই। স্বভাবতই জাতীয় গড় উৎপাদনের হার কম পক্ষে ৪০ মণ। বছরে ২৩০ লক্ষ একর জমিতে একবার মাত্র ধান উৎপাদিত করলে চাল উৎপাদনের পরিমান দাঁড়ায় বছরে ০২ কোটি ৩০ লক্ষ টনের মতো। দেশের তৎকালিন বর্তমান চাহিদা ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে থাকলে বাড়তি উৎপাদন থাকে ১ কোটি টন যার বর্তমান মূল্য ৫ হাজার কোটি টাকার উপরে। শুধু তাই নয় বৈদেশিক মুদ্রায় শস্য আমদানি খাতে যে ৫০০ কোটি ব্যয় হয় তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া সরকার প্রতিটি গ্রাম সমবায় থেকে যে ট্যাক্সস পাবে তার সমগ্র পরিমান দাড়ায় ১৫০ কোটি টাকা।

(২) বঙ্গবন্ধুর এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির তার থেকে বাড়তি ফসলের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তি গ্রামীণ সংখ্যা গরিষ্ঠ গরীব, ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেত মজুরদের অর্থনৈতিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে এসব গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী বিন্যাসে পরিবর্তন আনবে এবং ফলশ্রুতিতে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর প্রচণ্ড ধাক্কা দেবে। ঘুনে-ধরা সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসে যাবে এবং নতুন সমাজ নির্মাণের ভিত্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে।

(৩) চাষাবাদের যৌথকরণের শেষ পরিনতিতে শোষক জোতদার শ্রেণি ও কায়েমী স্বার্থ বাদীর সর্বশেষ ধুর্গ ভেংগে পড়বে। লক্ষ কোটি কৃষকের শোষণের অবসান হবে, শহর ও গ্রামের পার্থক্য লোপ পাবে। সামান্ত বাদের অবশেষ সমূহের বিলপ্তি ঘটবে। সর্বনাশা বেকারত্ব দূর হবে। এ ব্যবস্থায় গ্রাম জীবনের সঠিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। ক্ষেত মজুর, ভূমিহীন, গরীবও মধ্য কৃষকেরা প্রচন্ড শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে।

(৪) বঙ্গবন্ধুর এই গ্রাম সমবায় গ্রামীন জীবনের সঠিক বিষয়কে পরিচালনা করবে শোষিত মেহনতী মানুষ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ গণতন্ত্র শোষিত গণতন্ত্র, যার মূল ছড়িয়ে থাকবে প্রতিটি গ্রাম বাংলায় যা উচ্চাভিলাসী বা

বেপরোয়া মেজর, ছদ্দবেশী বিদেশি এজেন্ট এবং চতুর আমলা কোন দিন তাদের দখলে নিতে পারবেনা।

৫। বঙ্গবন্ধুর গ্রাম সমবায় এ গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে প্রশাসন কে জনগণের কব্জায় নিয়ে আসা। প্রশাসনকে উৎপাদনের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দায়িত্বশীল দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্রমুক্ত সচল ও গতিশীল প্রশাসন পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ও কার্যকরী সেল হিসেবে সার্বিক বিষয় গ্রাম সমবায়ের দায়িত্বে থাকত। এসব দায়িত্ব সমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পায় ২৫ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদর্শ উদ্বুদ্ধ সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী গ্রাম সমবায় এর আওতায় হাতে কলমে সৃষ্টি হতো। এতদিনকার সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া, বেকার জীবনের সর্বনাশা অপচয় ক্ষুধা আর দারিদ্রে দুর্বল, পর মুখাপেক্ষী এই বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর খবরদারী করা গুটিকয় ধনী কৃষক, মাতবর, জোতদার আর অতিচালাক, মোড়ল এবং তথাকথিত রাজনৈতিক টাউটদের মধ্য স্বত্ব ভোগীদের শেষ মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠত। এদের কবর রচিত হয়ে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষেরাই নতুন নেতৃত্বে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং বঙ্গবন্ধুর স্বার্থের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

ক্ষেতে খামারে কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি :

বঙ্গবন্ধু বলেন,"আপনারা জানেন, আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিন গুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারবো না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাই এর কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে। প্যান্ট পরা কাপড় পরা তাদের কাছেও চাই, জমিতে যেতে হবে। ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে শহীদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইন্‌শাআল্লাহ্ হবে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে। কল-কারখানায়, ক্ষেতে খামারে খাদ্যের প্রডাকশন বাড়ান।"

কিন্তু বাস্তবতা শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বললেই উৎপাদন বাড়েনা। আর উৎপাদন বাড়ালেও তা সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসেনা। ভূমিহীন ও গরীব চাষী এবং ক্ষেত মজুর যারা গ্রামীণ সামাজের শতকরা ৭৮ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করবে কার স্বার্থে? বা একজন শ্রমিক উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রক্ত পানি করবে

কেন? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। যেমন প্রচুর কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে বৈজ্ঞাননিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। কোনো কোনো দেশে তা সফলও হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে দেখা গেছে এক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট। কেননা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বাড়ানোর অর্থ ক্ষুদেক্ষুদে ব্যবস্থায় উৎপাদকদের ভূমি হতো উচ্ছেদ সাধন এবং জোতদার ধনী কৃষকদের জোত খামারের বৃহদায়তন ঘটানো। এব্যবস্থায় মধ্য কৃষক, গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষকে ও ভূমিহীন কৃষক ভিক্ষুকে পরিণত হয় এবং ধনী কৃষক আরো বেশি জমির মালিক হয়। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শোষণ আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। সেজন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেখা যায়, কৃষির উন্নতি হলেও সাধারণ কৃষকের উন্নতি হয় না। কৃষিতে পুঁজি বিকাশের প্রক্রিয়াগত কারণে যে সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় এই ভয়াবহ সংকটকে এড়ানো এবং সংকটের সুষ্ঠু সমাধানের চাবিকাঠি হল কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর। আর কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সমবায় হল প্রথম সোপান। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের স্বার্থে বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, জমি নয়, জমি হতে উৎপাদিত ফসলে ভূমিহীন কৃষক, গরীব চাষী এবং জমির মালিকের অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করা , অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল বণ্টনকে সামাজিক মালিকানার আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা। অনুরূপভাবে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেন।

গণমুখী প্রশাসন :

আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাস হলো যুগে যগে প্রশাসনিক চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের চরিত্র ও চেহারা ভিন্নতর হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের সময় হতে সামন্ত প্রথার শেষ কাল পর্যন্ত আলাতন্ত্রের যে ক্রম বিবর্তন লক্ষ করা যায় আমলারা চিরকালের কেনা গোলাম হতে মাইনে করা গোলামে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক যুগের বিচিত্র জটিলতায় আমলাতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র সামাজিক উচ্চ শ্রেনিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছে এবং পেরেছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যারা বিশ্বাসী তারা মনে করেন, আমলাতন্ত্রের অবাধ ক্ষমতা ও তথা কৃতিত্ব কর্মদক্ষতা হলো সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ব্যবস্থার চরমোৎকর্ষ। অথচ সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এ ধরনের গোড়ার কথা হলো, উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজের ধরনের ভিন্নতার পরিণতিতে আমলাতন্ত্রের

জন্ম সভ্যতার অগ্রগতির জটিলতার ফলে কায়িক ও মানসিক শ্রমের দূরত্ব বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মানসিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা প্রশাসন দখল করেছে এবং আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ধনতন্ত্রের যুগ হলো আমলাতন্ত্রের যুগ। কারণ ধনতন্ত্রের কাজ হলো শাসন করা আর আমলারা সে কাজেই পটু।

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের চরিত্র :

বৃটিশ শাসনে আমাদের দেশে শাসন ও শোষণ কার্য পরিচালনার জন্য আমলা তান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে ওঠে। সমাজের বিরাট অংশ যেখানে বাঁচার তাগিদে নির্জীব সেখানে আমলাতন্ত্রের প্রচণ্ড দাপট। কারন সমাজের বিরাট অংশের অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং বুদ্ধিগত দৈন্য থেকেই জন্ম নেয় আমলাতন্ত্রের অপ্রতিহত শক্তি। তাদের নিয়োগ থেকে শুরু করে ট্রেনিং আইন-কানুন ক্ষমতা ব্যবহার বিধি এমন এক অবসর গ্রহণের পরেও তাদের বিশেষ বিশিষ্টতা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আর সেজন্যই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তারা তাদের শ্রেণীর স্বার্থেই জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে, নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য অথবা কৌশলে শাসক আর শাসিতের মৌল পার্থক্য আড়াল করার জন্য কৃত্রিম গণমুখী সাজার ধোঁকাবাজী দেয়। উত্তরাধিকারসূত্রে বৃটিশ, পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র জনগণের হতে বিচ্ছিন্ন। জনগণের প্রতি বিমুখ জনগণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কায়েমী স্বার্থের পূজারী ধারক ও বাহক এই আমলাতন্ত্র দিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখী মোহনতী মানুষের কোন কল্যাণ হয় না।

আমাদের বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ও মনোভাব পুরোপুরি বিদ্যমান। প্রশাসনের উঁচু থেকে নীচু তলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী। আছেন মন্ত্রী পরিষদ, সচিব এবং বিশাল সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। তারপর আছেন বিভাগীয় কমিশনার বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসক। থানা পর্যায়ে টিএনও। এরপর বহুদূর মাটি ও সাধারণ মানুষ। এমন একটি মাথা ভারী, নড়বড়ে, আলসে জনগণকে ঠকিয়ে রাখা প্রশাসন দিয়ে হাজার বছর চেষ্টা করলেও জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জন অসম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের এই ফাঁক আর ফাঁকির কৌশলের দিকটা যে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন, দুঃখী মানুষের গ্রামের মানুষের সার্বিক মুক্তির স্বার্থে তিনি নতুন প্রশাসন কাঠামোকে গড়ে তোলার প্রয়াসী হলেন। বললেন, "আমলাতন্ত্রের কালো হাত ভেঙ্গে ফেলো প্রশাসন ব্যবস্থার সচল কাঠামো নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি বললেন, "কলোনিয়াল

পাওয়ার ও রুল দিয়ে দেশ চালাইতে পারে না। এই এডমিনিস্ট্রেশন, তারপর আমাদের এই সেক্রেটারিয়েট এসব ভাঙ্গতে হবে। এসব চলতে পারে না আই এ্যাম গোয়িং ফর দ্যাট। সেকশন অফিসার তারপর ডেপুটি সেক্রেটারী তারপর আসে আমার কাছে। এসবের প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি কাম চালান।" পরিবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু বললেন, "ইডেন বিল্ডিং বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায় জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুযোগ সুবিধা পায়। সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জেলায় আমরা কানেকশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সঙ্গে থানার, থানার সংগে ইউনিয়নের কানেকশন রাখতে হবে।"

প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসন বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হলো। এ নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বললেন "ষাটটি সাব ডিভিশন হবে ষাটটি জেলা প্রত্যেক জেলার জন্য একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, সরকারী কর্মচারীগণ থাকবেন। এদের নিয়ে একটি করে এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল থাকবে তারপর একজন গভর্নর তিনি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা চালাবেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেকট কন্ট্রোলে এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল, ডিস্ট্রিকট এডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে। শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীয় করণ করা হবে।"

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ হলো শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম। উৎপাদন উন্নয়ন ও গ্রামমুখী প্রশাসন শাসন বা শোষণ নয় এই লক্ষকে কেন্দ্র করেই এ প্রশাসনের যাবতীয় কাঠামো ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট হলো। উৎপাদনের স্বার্থে উৎপাদন টার্গেটকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচির সৃষ্টি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এ প্রশাসন ব্যবস্থার যাবতীয় উদ্যোগ স্বভাবতই গ্রামমুখী হবে শহরমুখী বা ফাইলমুখী নয় "নোটিং" আর ফাইলিং এর সুচারু বিন্যাসের নয় বরং কর্মের সফল সম্পাদন উন্নতি বা প্রমোশনের মাপকাঠি বলে বিবেচিত হলো। ফাঁকি আর ফাঁকির চাটুকারী, তোষামোদী, গলাবাজীর দিন ঘনিয়ে এলো, কর্মের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলো। জেলায়-জেলায়, থানায়-থানায়, গ্রামে-গ্রামে, জেলার গভর্নর পদে বঙ্গবন্ধু বললেন, "এমপি আছে, নন এমপি আছে, সরকারী কর্মচারী আছে আর্মি অফিসার আছে, কম্পিটিশন ভালো হবে।" কম্পিটিশনের দেশ গড়ার এই লড়াইয়ে জনগণ হবে মূলনায়ক। অফিসার নয়,

প্রশাসন কে দল বল নিয়ে নেমে আসতে হবে কার্পেট মোড়ানো কক্ষ থেকে গ্রামের উদার প্রান্তরে দুঃখী মানুষগুলোর কাছে চিরদিনের জন্য সব সময়ের জন্য, লোক দেখানো লোক ঠকানো এক দিনের উৎসবী কোদাল ধরার জন্য নয়। বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে বললেন, সরকারি কর্মচারি, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট আমরা সবাই জনগণের সেবক, মাস্টার নই। মেন্টালেটি আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তাদের জন্য কী করলাম? সেটিই আজ বড় প্রশ্ন।"

জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত দরিদ্র অংশকে জড়িয়ে তাদের জন্য, তাদের মধ্য থেকে তাদের হয়ে তাদের হৃদয় আর রক্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মের নিবিড় বন্ধনের মাঝে এই নতুন প্রশাসনের ব্যবস্থার ভিত্তি ভূমি রচিত হলো। শুধু মাত্র বাস্তব ভিত্তিক ভূমি রচনা করেই বঙ্গবন্ধু ক্ষান্ত হলেন না। বরং এই প্রশাসনকে কার্যকরও দায়িত্বশীল ব্যবস্থা হিসাবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি নির্বাহিক আর বিধানিক ক্ষমতার পরস্পর বিচ্ছিন্নতা এবং অপ্রকাশ্য বিরুদ্ধতা দূর করলেন। তিনি বললেন, "আর একটি জিনিস মার্ক করলাম সেটা হলো এই যে, একদল বলে আমরা বুরোক্রাট, তাদের এটিচিউট হলো হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিশিয়ান। পলিটিশিয়ানরা তাদের স্ট্রেংথ দেখবার জন্য বলতো যে অলরাইট, গেট আউট প্রশাসনিক আর বিধানিক ক্ষমতার মধ্যে এই মনোভাব সুষ্ঠ রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে মারাত্বক ক্ষতিকর।" সেজন্য তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সৎ ও যোগ্য কর্মচারি এবং জনগননের আস্থাভাজন কর্মী সমন্বয়ে এক নতুন প্রশাসনের কার্যকর কাঠামো গড়ে তুললেন। কেননা, তিনি উপলব্ধি করলেন, বর্তমান প্রচলিত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় জনপ্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট হতে স্থানীয় উন্নয়ন, স্থানীয় বহুমূখী সমস্যার সমাধান আশা করে যে, তারা সব কাজ করে দেবেন। কিন্তু দায়িত্ব ক্ষমতা যে ক্ষমতার লাগাম হাতে নিয়ে বসে থাকে আমলাতন্ত্র। যারা জনগণের দায়িত্ব নেয় না জনগণকে তাদের সমস্যাকে নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে এড়িয়ে যেতে চায়। তাই বঙ্গবন্ধু প্রশাসনিক আর বিধানিক কাঠামোকে একত্রীকরণ করে এমন এক প্রশাসন যন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়ে ছিলেন যা জনগণের সার্বিক মুক্তির দায়িত্ব নেবে।

যা জনগণকে টেনে তুলে এনে রাষ্ট্র পরিচালনায় কার্যকর অংশ নিতে এবং গ্রামীণ সক্রিয় ভূমিকা নেবে। প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা-প্রশাসক জনগণের নিকট দায়ী নন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি দায়ী থাকেন। সেজন্য উর্ধ্বতন কর্তা

ব্যক্তিটিকে সন্তুষ্ট রাখাই হলো তার অহর্নিশ প্রয়াস। সেজন্য জনগণের মঙ্গল অমঙ্গলের তোয়াক্কা না করেই তিনি পরম দাপটে জেলা শাসন করেন। বঙ্গবন্ধু এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে জেলা গভর্নরকে জনগণের নিকট দায়ী করলেন। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জেলা গভর্নর নির্বাচিত হবেন বিধায়, জনগণের নিকট তাকে দায়ী থাকতে হবে। অন্যদিকে জাতির জনক যৌথ প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করলেন। এই যৌথ প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি, দলের পরীক্ষত ও সাচ্চা নেতৃত্ব, নিপীড়িত ও শ্রমিক ও কৃষকের সবচেয়ে সচেতন উদ্যোগী অংশের নেতৃত্ব, যুব ও মহিলা প্রতিনিধি শৃঙ্খলা বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি, দক্ষ ও সৎ সরকারি কর্মচারি সমন্বয়ে গড়ে উঠবে। যা একটি সচল কর্মক্ষম উদ্যোগী। উৎসাহী কর্মপ্রয়াসের একটি সবাক সচল শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত প্রশাসনের আরো একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের স্থানীয় ক্ষমতা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নয়। বরং জনগণের সমস্যাকে স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করে। পরিকল্পিত উপায়ে দ্রুততম সময়ে তা সমাধান করার জন্য জনগণের হয়ে জনগণকে সংগঠিত করে। প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করবার নেতৃত্ব আরোপিত হয়ে ছিলো এ প্রশাসনের উপর। এক কথায় সবার সমস্যা সবার সঙ্গে আলোচনা সমস্যাকে চিহ্নিত করা এবং সবাইকে নিয়ে একযোগে কাজে নেমে পড়া। কাজে নেমে পড়ার দুরূহ এই ব্যাপক দেশ গড়ার কাজে নিজেদের জড়াবে তখনই যখন তারা দেখবে এবং বুঝবে যে, এদের কাজে নেমে পড়ার আন্তরিকতার ফাঁকি নেই এবং তাদের জন্যই এসব কাজ হচ্ছে। বর্তমান প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনগণের সম্মিলিত ও সংগঠিত অংশগ্রহন অসম্ভব।

আজকের অভিজ্ঞতা পুনরায় নতুন করে প্রমাণ করছে এবং যত দিন যাবে ততবেশি করে আরো প্রমান করবে, বর্তমান এডমিনিস্ট্রেশনস সিস্টেম দ্বারা জনগণের যথার্থ কল্যাণ করা যায় না। ইতিহাস এ কথা বার বার প্রমাণ করছে। বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোয় রাষ্ট্রীয় জীবনে দক্ষ সৎ ও সুযোগ্য ব্যক্তি ক্ষমতায় বসলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তেমন কোন মঙ্গল হয় না অথবা এ অবস্থায় মন্ত্রীর পর মন্ত্রী বদল করেও তেমন উল্লেখযোগ্য ফল লাভ করা যায় না। কেননা প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থায় কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব থাকে আমলাদের একটি বিশাল বাহিনীর হাতে। মন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদ শুধু মাত্র নীতি-নির্ধারণ ও নীতি কার্যকরণের অর্ডার লিখেই মুক্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনে তাদের যে

আদেশ কার্যকরভাবে ক্রিয়াশীল নয় কেননা উঁচু থেকে নীচু সর্বত্র এই প্রশাসনিক বাহিনী শুধু মাত্র অগণতান্ত্রিক নয় এর উচ্চতর অংশ মতলববাজ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অভিজ্ঞ, বিদেশি এজেন্ট এবং দুর্নীতির পঙ্কিলে নিমজ্জিত। প্রচলিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত,এডমিনিস্ট্রেশনের এই ভয়াবহ অবস্থার কালো হাত থেকে পরিত্রান প্রয়াসে বঙ্গবন্ধু বললেন, "আজকে আমি সেই জন্য চাচ্ছি আর্মির মধ্যে হোক, বি.ডি.আর হোক পলিটিশিয়ান হোক, যেখানেই হোক, ভালোলোক যেখানে আছে তাদের এক করে কাজে লাগাতে হবে। যাও ওখানে বসে কাজ করে নিয়ে আস।"

প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই ব্যাপক গণতান্ত্রয়নের অর্থ হলো জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করবে। নিজেই সমস্যা দেখবে এবং সমাধান করবে। তারাই তাদের ভাগ্য নিয়ন্তন করবে। মোট কথা, বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও উৎপাদন মুখী, গণতান্ত্রিক, আমলাতন্ত্রমুক্ত গ্রামমুখী, চটপটে, ঝরঝরে, ত্বরিত কাজে নেমে পড়তে সক্ষম, কার্যক্রম দায়িত্বশীল ও বিকেন্দ্রীয়কৃত যৌথ প্রশাসন যা বাংলার দুঃখী মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রাথমিক সোপান। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত প্রশাসনের তুলনামূলক চিত্র:

১। বর্তমান এডমিনিস্ট্রেশন স্থবির দুর্নীতিপূর্ণ মাথা ভারী। ঘোরালো এবং পুরাপুরি আমলাতান্ত্রিক যা জনগণের তেমন মঙ্গল আসে না। সেখানে বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থা সরাসরি আমলাতন্ত্রমুক্ত সচল এক বিকেন্দ্রীয়কৃত শক্তি।

২। বর্তমান কলোনিয়াল পাওয়ারের প্রশাসন শুধুমাত্র জনগণকে শাসন করার জন্য, তাদের উপর খবরদারী করার জন্য তৈরি। বঙ্গবন্ধু সেখানে প্রশাসনকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করলেন শাসন বা মোড়লীপনাকে বিদায় করলেন।

৩। বর্তমান প্রচলিত এডমিনিস্ট্রেশনে অফিসারই মুখ্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থায় জনগণ হবে মূল নায়ক অফিসার নয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

৪। বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসনকে জনগণের নিকট দায়ী করা হলো।

৫। বর্তমান ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন এক ব্যক্তিক বিধায় স্বেচ্ছাচারী। বঙ্গবন্ধু সেখানে জেলা এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ও গভর্নরকে নিয়ে যৌথ প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটালেন।

৬। বঙ্গবন্ধুর প্রশাসন ব্যবস্থায় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য দিক হলো নির্বাহী আর বিধানিক এই দুই পরস্পর বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্রীকরণ।

৭। প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে বঙ্গবন্ধু স্থানীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ বাস্তবায়নের অবাধ অধিকার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন এবং বিপুল জনগষ্ঠীকে প্রশাসনে টেনে এনে একে ব্যাপকভাবে গণতন্ত্রায়ন করলেন।

গণমুখী বিচার ব্যবস্থা :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের যুগান্তকারী এবং বৈপ্লবিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার স্থবিরত্বকে ভেঙ্গে একে গণমুখী করার জরুরি কার্যক্রম ঘোষণা করলেন। বিচার ব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সাজানের প্রয়াস নিলেন যাতে মানুষ হাতের কাছে বিচার পেতে পারে এবং বিচার প্রার্থনা সহজ লভ্য হয়ে উঠে। কেননা, বর্তমান বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘ সূত্রতায় আকীর্ণ এবং হয়রানী মূলক, কোর্টের লাল ইটের চারপাশে "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধু বললেন, "বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে সেই মামলা শেষ হতে লাগে বিশ বছর। আমি যদি উকিল হই আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে সেই কেস দিয়ে যাই, ঐ মামলা ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিন্যাল কেস হয়, তিন বছর চার বছর আগে শেষ হয় না । এই বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রইবুন্যাল করার চেষ্টা করছি, সেখানে মানুষ যাতে এক বছর দেড় বছরের মধ্যে বিচার পায় তার বন্দোবস্ত করছি।"

বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় মানুষ সুষ্ঠু বিচার পায় না। সমাজ কাঠামো হতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সুযোগ নিয়ে গ্রামের গরীব মানুষ বিচারের নামে দিনের পর দিন হয়রানি হতে হয়। তাকে উকিল ঠকায়, গ্রামের টাউটরা ঠকায়, পেশকার, পেশাদারেরা, সবাই মিলে তাকে শোষন করে। শোষণের চক্র, ঘুষও দুর্নীতির চক্রতার চার পাশ আটকে ধরে। বিচার পেতে এসে সে হয় সর্বস্বান্ত। বিচারের নামে অবিচারের এই ফাঁদ থেকে তাকে মুক্তি পেতে হলে ভেঙ্গে ফেলতে হবে পুরনো দুর্নীতিপর্ণ লোক দেখানো এই বিচার ব্যবস্থাকে। "ঘুষের আড়ৎ" হতে বিচারককে মুক্ত করে নিয়ে থেকে হবে গ্রামে খোলা প্রান্তরে মাটির মানুষদের কাছাকাছি।

সেজন্য বঙ্গবন্ধু বললেন "গ্রাম বাংলার মানুষ যাতে সুবিচার পায় তার জন্য বিচার ব্যবস্থাকে তাদের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।" এ প্রসঙ্গে কতিপয় বিষয়ে গ্রামের বিচার গ্রামের হাতেই ছেড়ে দেবার পরিকল্পনায় সমাজতান্তিক রীতি পদ্ধতি বিবেচ্য হতে পারে।

প্রচলিত বিচার পদ্ধতিতে অর্থই বিচারের প্রকৃত মানদন্ড হয়ে দাঁড়ায়। যিনি অর্থবান তিনি অর্থের সাহায্যে বড়বড় ব্যারিস্টার এডভোকেট লাগাতে পারেন। গরীব মানুষের পক্ষে যেহেতু তা সম্ভবপর নয় সেজন্য সুবিচারের সুযোগ পাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেজন্য গ্রামের বিচার গ্রামে বা থানায় করার মহান লক্ষে বঙ্গবন্ধু বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। যেখানে বিচার থাকবে হাতের নাগালের মধ্যে, অর্থ দিয়ে বিচার কেনা যাবে না।

বর্তমান বিচার ব্যবস্থা প্রশাসনের কবজায়। আদালতে যিনি নির্বাহী প্রশাসক তিনিই আবার বিচারক। এ এক অদ্ভূত বিচার পদ্ধতি। নির্বাহী প্রশাসক যেহেতু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকেন এবং রাজনৈতিক নির্দেশ পালনে দায়িত্ববদ্ধ সেহেতু তিনিই আবার যখন বিচারক তখন বিচার হয় এক-তরফা দেশদশী ও পক্ষপাতদুষ্ট। এ ব্যবস্থার সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বিচারের আশা ও করা যায় না। সেজন্য বঙ্গবন্ধু বললেন, "বিচার বিভাগ হবে সম্পর্ণ স্বাধীন। বিচার ব্যবস্থাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ২২নং ধারায় বলে দিলেন "রাষ্ট্র নির্বাহী অংগ সমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন।" শুধু তাই নয় বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে বাকশালের ষষ্ঠ ধারায় ১০ উপধারায় বলা হলোঃ কোন সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান আইন বলে গঠিত সংস্থা ও কর্পোরেশন প্রভৃতির কোন কর্মচারি সদস্য পদ প্রার্থী হইলে তাঁহাকে পূর্ণ সদস্য পদ কিংবা প্রার্থী সদস্যপদ দানের ক্ষমতা জাতীয় দলের চেয়ার ম্যানের উপর ন্যাস্ত থাকবে, তবে দেওয়ানী আদালতের বিচার কার্যে নিযুক্ত কোনো কর্মচারী বা বিচারক আদৌ জাতীয় দলের সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারবেন না।" মূলত বঙ্গবন্ধু এমন এক বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন, বিচার ব্যবস্থা হবে গণমুখী ঝর ঝরে। ত্বরিৎ বিচারকার্য সমাধা করতে সক্ষম যা দুঃখী মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে। প্রয়োজনে গ্রামের বিচার গ্রামের ঘটনা স্থলেই সম্পন্ন হবে মানুষকে অযথা হয়রানির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। থানায় থাকতো ট্রাইব্যুনাল। দুঃখী মানুষ ন্যায্য বিচার পেত। বিচারের নামে অবিচার এবং কালহরণ বন্ধ হতো। স্বাধীন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু

বিচারের গ্যারান্টি মানুষ পেত। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হতো।

বাকশালের সামাজিক দিক :

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগের কর্মসূচির সামাজিক দিকের দুটো প্রধান ভাগ নিম্নরূপ।

(ক) দুর্নীতি উচ্ছেদ

(খ) পরিকল্পিত জন সংখ্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

দুর্নীতি উচ্ছেদ :

বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা জনগনকে দূরে ঠেলে রাখে। অধিকন্তু জনগণ হতে সার্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন প্রচলিত এ শাসন ব্যবস্থার এক মাত্র উদ্দেশ্য জনগণকে ফাঁকি দেওয়া। তাদেরকে শোষণ এবং শাসন করা। যার ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি প্রশাসনের উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। উপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি বন্ধ করা যায় না। বঙ্গবন্ধু বললেন, "ঘুণে ধরা সিস্টেম দ্বারা করা প্রশাসন বন্ধ করা যায় না। এই সিস্টেমই করা প্রশাসন পয়দা করে এবং এই সিস্টেমেই করা প্রশাসন চলে।" উত্তরাধিকারসূত্রে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা এবং প্রচলিত এডমিনিস্ট্রেটিভ সিষ্টেমের স্বাভাবিক কার্যকরণ গত অবস্থার প্রেক্ষিতে আজ দুর্নীতি ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রন্ধ্রে শিকড় গেড়েছে।

কিন্তু এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে না পারলে জাতীয়জীবনে বহু সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না করা পর্যন্ত দুর্নীতি উচ্ছেদ সম্ভব নয়। কেননা দুর্নীতি হলো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার একটি প্রক্রিয়াজাত ফলাফল। সেজন্য বঙ্গবন্ধু পুঁজিবাদী সমাজকে ভেঙে নুতন সামাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষে বাকশাল কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি দুর্নীতিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গনে এনে ব্যাপক গণপরিসরে একে পর্যুদস্ত ও বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। প্রশাসন যন্ত্রের ব্যাপক দুর্নীতি ব্যবসা বানিজ্য শিল্প অঙ্গনে দুর্নীতি ও কারচুপি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশচুম্বী অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যক্ষকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দরিদ্র শ্রেণিও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দুর্নীতির দরুন উৎপাদন ক্ষেত্রেও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি উপকরণের কালোবাজারীও উচ্চমূল্যের কারণে কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। নানা কারচুপি, ভ্রান্তনীতি ও দুর্নীতির ফলে কৃষক অর্থকরী

ফসল পাট, তামাক, আঁখ ইত্যাদির প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না। শিক্ষা অঙ্গনেও নানাবিধ দুর্নীতির কারণে আজ অরাজকতা নৈরাজ্যিক অবস্তা বিরাজ করছে। শহর বন্দর ও গ্রামের সাধারন মানুষও দুর্নীতিবাজ টাউট বাটপার, চোর ডাকাত বদমায়েশের অত্যাচারে অসহায় ও অস্বস্তিকর জীবন যাপন করেছে। এক কথায় সমাজের সর্ব শ্রেণির মানুষই দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের চাপে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

তাই সমাজ দেহ হতে দুর্নীতি বৃষ বৃক্ষটির মূল্যেৎপাটনের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতির প্রতি উদাত্ত আহব্বান জানান। তিনি বলেন, "আমি বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে জেহাদ করতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে শুক্রর বিরুদ্ধে। আজ আমি বলব, বাংলার জনগণ এক নম্বর কাজ করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। শপথ করতে হবে আইন চালাবো ক্ষমা করবে না, যাকে পাব ছাড়াবো না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণ-আন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে নামবো, এমন আন্দোলন করতে হবে যে ঘুষ খোর দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চালান দেয় তাদের সামাজিক বয়কট করতে হবে। আপনারা সংঘবদ্ধ হোন, ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সেই দুর্গ হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য, এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ দুঃখ মোচন হয়ে যাবে।" বাকশাল সিস্টেমের মাধ্যমেই দুর্নীতিবাজ ও সমাজ বিরোধীদের উৎখাত করে দুর্নীতি ও শোষনমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

(ঘ) পরিকল্পিত জনসংখ্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রন :

বাংলাদেশের আয়াতন ৫৪ হাজার ৫৫৫ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা তৎকালীন প্রায় ৯ কোটি (বর্তমান ১৬ কোটির উপরে) বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা। এ জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জ্ঞান ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দ্বারা বলেছিলেন যে, "পরিকল্পিত জনশক্তির ছাড়া এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।" তাই তিনি কার্যকরী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত জনসংখ্যা সৃষ্টির লক্ষে দেশবাসীর প্রতি আহব্বান জানান।

তিনি বলেন, "একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আম্মদের দেশে প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ছে। আমার জায়গা হলো ৫৪ হাজার বর্গ মাইল এর

কিছু বেশি। যদি আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর এই হারে লোক বাড়ে তাহলে ২৫ বছরে বাংলায় চাষ করার মতো জমি থাকবে না। সেই জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে।" এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন হতো এবং পরিকল্পিত জনশক্তি ও জনসংখ্যা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ ছিল এক অসম সাহসী যুদ্ধ। একদিকে মধ্য যুগীয় ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রজ্যবাদের করাল গ্রাসে, মাঝখানে অনগ্রসর কৃষিনির্ভর সমাজ এবং তাঁর সামন্তবাদী ব্যবস্থার অক্টপাস বঙ্গবন্ধুকে এই বহুভুজ দানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার স্বপ্নের সোনার বাংলা নব্য বাংলা গঠনের পথে এগুতে হয়েছে। রাষ্ট্রে ক্ষমতা গ্রহণের পর হানাদার মুক্ত বাংলাদেশে মাত্র তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্ধস্থ অর্থনীতি পুনঃনির্মাণে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি জানতেন শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক অর্থবহ হয় না। তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ তাই ছিল দেশীয় শোষকেদের উৎখাত এবং শষিত জনগণের সার্বিক মুক্তি। দেশীয় শোষক এবং তাদের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকদের চক্রান্তে তিনি রক্ষা পাননি। তাঁর দুখী মানুষের মুক্তির লক্ষে নিজের, স্বজনের রক্ত ঢেলে বাংলার মানুষের কাছে তিনি তার অঙ্গীকার পূরণ করে গেছেন। তাঁর অঙ্গীকার ছিল, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব। প্রয়োজনে নিজের বুকের রক্ত ঢেলে তোমাদের রক্তের ঋণ শোধ করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।"

বৃটেনের প্রয়াত মানবতাবাদী রাজনীতিক লর্ড ফেনর রকওয়ে বলেছেন "শেখ মুজিব শুধু বাংলাদেশকে একবার স্বাধীন করেননি, দু'বার স্বাধীন করেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানী হানাদারদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়ন করেছেন। ১৯৭২ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র তিন মাসের মধ্যে তাঁর প্রস্তাবে এবং অনুরোধে মিত্র ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে চলে গেছে।"

ভাবতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব যদি সফল হতো, তাহলে বাংলার মানুষকে তিনি তাদের তৃতীয় দফার স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও উপহার দিয়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে দেশ দ্রোহী ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির জনক, তাঁর স্ত্রী, সন্তান, স্বজন ও সহকর্মী। চারজন জাতীয় নেতাকেও কারা অভ্যন্তরে প্রাণ দিতে হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ জীবন সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মানুষ জন্তু হুংকারে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বার বার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিসর্জিত, অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শোষণ ও অবাধ দুর্নীতি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও আদর্শ আজ আরো বেশি প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে ও আদর্শে জনগণকে দুঃখী মানুষকে আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। নেতার নশ্বর দেহ নেই। তাঁর অবিনশ্বর আদর্শ তো আমাদেরকে দিয়ে গেছে। জাতিকে বিভ্রান্ত করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু ঐক্যবদ্ধ সংকল্পবদ্ধ হয়ে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হবে। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের পটভূমিকায়, বাকশাল কনসেপ্ট ও কর্মসূচি সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ রচয়িত "আমি বেঁচে থাকবো" বইতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায়

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দিন শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে যাওয়ার কথা ছিল। ১৫ আগস্ট এই দিনের সুবেহসাদেকে একদল খুণি দৃস্কৃতকারী রাজধানীর ঢাকার ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হানা দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী এবং বাঙ্গালী স্বাধীকার আন্দোলন সংগ্রামের প্রেরণাদাত্রী মহিলা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, তাদের বড় ছেলে শেখ কামাল, মেঝো ছেলে শেখ জামাল, ছোট্ট কিশোর শেখ রাসেল, পুত্রবধু সুলতানা কামাল, ও রোজী জামালকে, হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসেরকে।

একই রাতে খুনি দল হানা দেয় বঙ্গবন্ধু সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী, আবুদুর রব সেরনিয়াবাতের মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে। সেখানে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়া বাত, তাঁর কিশোর ছেলে আরিফ, কিশোর মেয়ে বেবী, নাতী ছোট্ট শিশু বাবু এবং ভাইয়ের ছেলে শহীদ সের নিয়াবাত ও আত্মীয় আবু নাঈম রিন্টুকে। আহত করে সেরনিয়াবাতের স্ত্রীকে। হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে এবং জাতীয় যুব লীগের তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি এবং তাঁর অন্তঃসত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মানিকে।

বঙ্গবন্ধুর আহবানে তাঁকে রক্ষা করতে এলে ৩২ নম্বর রোডের মুখে ঘাতক চক্র হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর এক কালীন সামরিক সচিব কর্ণেল জামিলকে। ১৯৭৫ সালে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানীতে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসের জগন্যতম ও বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ডে ঘাতক চক্র একই রাতে বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবসহ তার পরিবারের ৪৬ জন সদস্যকে হত্যার মধ্য

দিয়ে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়। এই নির্মম হত্যা কাণ্ডে সারা জাতি হয়ে পড়ে ছিলো হতবাক, নীরব, নির্বাক। এই হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক চক্রের হাতে নির্মম ভাবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার বিয়োগান্ত ঘটনা।

জাতির জনককে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর নেপথ্য নায়ক খুনি মুশতাক, ফারুক রশিদ, ডালিম, তাহের গং এদেশে অসাংবিধানিক ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু করে। যা পরবর্তিতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান, এবং হত্যা করে ক্ষমতা দখলের পালা শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনি মোশতাক অসাংবিধানিক ও অবৈধভাবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। শুরু হয় স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে দেশকে একটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত করার অপ-চেষ্টা চালানো হয়। সংবিধান থেকে একে একে বাদ দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অন্যতম, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদকে বানানো হলো বাংলাদেশী। মুক্তি যুদ্ধের রণধ্বনি "জয় বাংলা" কে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে রেডিও বাংলাদেশ। যা পাকিস্তানকে অনুকরণ। বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় মীর জাফর হলো খন্দকার মুশতাক।

পরবর্তীতে জিয়া, এরশাদ একই ধারায় পরিচালিত করতে লাগলো দেশ। '৭৫ এর ২৬ সেপ্টেম্বর মাসে খুনি মুশতাক অবৈধ ভাবে জারি করলো ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশটিতে দুটি ভাগ একটি অংশে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বলবৎ আইনের পরিপন্থী যা কিছুই ঘটুক না কেন, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টসহ কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি উল্লেখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে যাদের প্রত্যয়ন করবেন তাদের দায়মুক্তি দেয়া হলো। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোনো আদলতে মামলা অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়া করা যাবেনা।

১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ কারী হিসাবে আবির্ভূত হন। সে সময় বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

১৯৭৬ সালের ২৯ এপ্রিল জনাব সায়েম জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জিয়া রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইনের অধীনে দেশে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডসহ ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ইন ডেমনিটি অধ্যাদেশসহ চার বছরের সামরিক আইনের আওতায় সব অধ্যাদেশ, ঘোষণাকে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়।

১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল সংশোধনীটি পাস হয়। এতে বলা হয়েছে "১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রণিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হইয়াছে, তাহা এবং অনুরূপ কোনো ফরমান, সামরিক আইন প্রণিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোনো আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতা বলে, অথবা অনুরূপ বিবেচনা কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো দন্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো ব্যাক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশকৃত কাজকর্ম ব্যবস্থা বা কার্যধারা সমূহ এত দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐ সকল আদেশ কাজ কর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারা সমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল। এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।" যা ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনী আইনে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৮ অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে বৈধতা দেওয়ায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীরা দায়মুক্তি পেয়ে যায়। মুশতাকের শাসন আমলের জারি রহমানের শাসন আমলে বৈধতা দেওয়া না হলে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল সামরিক আইন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই ১৫

আগস্টের খুনিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হতো। সামরিক বাহিনীর হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিচার পতি আবদুস সাত্তার এইচএম এরশাদ এবং ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা এলেও ইডেমেনিটি অধ্যাদেশটি বাতিল বা রহিত করেননি। ফলে দায় মুক্তি পেয়ে খুনিরা ১৫ আগস্টের হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াত। এমনকি ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে খুনিরা অংশ গ্রহণ করে।

দীর্ঘ ২১ বছর আন্দোলন সংগ্রাম করে ১৯৯৬ সালে ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। ২৩ জুন শেখ হাসিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদে ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ (রহিত করন) বিল উত্থাপন করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর আইনটি সংসদে পাস হয়। ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর এটি পরিপূর্ণভাবে আইনের পরিণত হয়। ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশটি বিলুপ্তি বলে গণ্য হয়।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারি মহিতুল ইসলাম ২০ জনকে আসামী করে ১৯৯৬ সালে ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করেন। এবং ১৯৯৮ সালে নভেম্বর মাসে ১৫জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রায় ঘোষণা করা হয়।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি, জামায়েত চার দলীয় জোট সরকারের আমলে এই মামলার আপিল বিভাগে শুনানি না করায় মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকে।

২০০৮ সালে আওয়ামীলীগ নির্বাচনে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের পর পুণরায় বিচার কাজ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় দীর্ঘ ৩৪ বছর পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১৯ নভেম্বর ২০০৯ এ সকাল ১১টার সময় পূর্নাঙ্গ রায় ঘোষণা করেন।

১৯৯৬-২০০৯ পর্যন্ত মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১৯৯৬ সালে শুরু হয় মামলার কার্যক্রম। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার মহানগর দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল রায় ঘোষণা করেন। ১৫ জনকে

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল ও মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করনের শুনানি শুরু হয়। ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন। মাননীয় বিচারপতি রহুল আমিন ১০ জন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। অপর মাননীয় বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ১৫জন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

হাইকোর্টের ৩য় বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে রায় এবং তিন জনকে খালাস দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক চার আসামি মেজর (অব:) বজলুল হুদা, লে: কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে: কর্নেল (অব:) সৈয়দ শাহ্‌রিয়ার রশিদ খান ও মহিউদ্দিন লিভ টু আপিল করেন। আপিল বিভাগে এই আপিল শুনানি করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ না দেওয়া গত আট বছর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে তা ঝুলে ছিল।

এ সময় যে সব বিচারপতিকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল সেসব বিচারপতি হাইকোর্টে মামলা গ্রহণ করায় তাঁরা মামলার শুনানি গ্রহন করতে পারেননি। আবার অনেক বিচারপতি শুনানিতে বিব্রত বোধ করেন।

বিগত বিএনপি জামায়াত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পাঁচ বছর আপিল বিভাগে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আসামিদের আপিল অনুমতির আবেদন (লিভ টু আপিল) বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শুনানি শুরু হয়। ২০০৭ সালের ২ আগস্ট মাননীয় প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোঃ তোফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন। এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পাঁচ আসামির আপিল অনুমতির আবেদন মঞ্জুর করেন। ৩০ অক্টবরের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র আদালতে জমা দিয়ে নিয়মিত আপিল করতে আসামি পক্ষকে নির্দেশ দেন। আসামি পক্ষ যথা সময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপিল বিভাগে জমা দেন। রাষ্ট্র পক্ষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় দেড় বছর পর্যন্ত আপিল শুনানি হয়নি।

২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আপিল বিভাগের বিচারক সংকট দূর করতে ১৪ জুলাই চারজন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয় এবং আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২৩শে আগষ্ট রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান আইনজীবী জনাব আনিসুল হক আপিল বিভাগে আপিলের সার সংক্ষেপ জমা দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে চেম্বার জজ ৫ অক্টোবর আপিল শুনানির দিন ধার্য করেন। এর আগে ৪ অক্টোবর আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি তাফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সমন্বয়ে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন। এরপর আপিল শুনানি শুরু হয়। ২৯ কার্য দিবস আসামি ও রাষ্ট্রপক্ষের শুনানির শেষে ১৯ নভেম্বর ২০০৯ রোজ বৃহস্পতিবার ঐ রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করে আপিল বিভাগ। বেলা ১১.৪৫ মিনিটে এজলাসে বসেন আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি। আদালত কক্ষে তখন নীরবতা আসন গ্রহণের পর আসামিদের আপিলের বিষয়ে আট পৃষ্ঠার রায় পড়া শুরু করেন। ঘড়ির কাঁটা যখন ১১টা ৪৬ মিনিট। তখন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়া শুরু করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জল ইসলাম। রায় শেষ করলেন ১১টা ৫৮মিনিটে। বিশেষ বেঞ্চের নেতৃত্ব দানকারী মাননীয় বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জল ইসলাম শেষাংশে মাননীয় বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম ৬টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে বলেন "আপিল ও জেল আপিল খারিজ করা হলো।" এই আদালতের রায় কার্যকরের স্থগিতাদেশ বাতিল করা হলো। মাত্র ১২ মিনিটে রায়ের সংক্ষিপ্ত আদেশ দেন আদালত। "বলা হয় এ সংক্ষিপ্ত আদেশ মূল রায়ের অংশে থাকবে। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পাঁচ আসামির আপিলের পাঁচ যুক্তির ওপর রায় দেন আপিল বিভাগ। আসামিরা হলেন, (১) সৈয়দ ফারুক রহমান (২) বজলুল হুদা, (৩) আর্টিলারী মহিউদ্দিন (৪) ল্যান্সার মহিউদ্দিন আহমেদ ও (৫) সুলতান শাহারিয়ার রশিদ খান। অপর সাত আসামি আপিল করেনি বিধায় ৫ আসামির আপিল খারিজ হওয়ায় হাইকোর্টের রায় ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকল।" অন্য ০৭ আসামির মধ্যে আজিজ পাশা মারা গেছেন। পলাতক আসামিদের মধ্যে (১) খন্দকার আবদুর রশিদ (২) শরিফুল হক ডালিম (৩) এএম রাশেদ চৌধুরী (৪) এস এইচ বি এম বি নূর চৌধুরী (৫) আবদুল মাজেদ ও (৬) মোসলেম উদ্দিন।

রায় ঘোষণা শেষে উপস্থিত আইনজীবীরা উল্লাস প্রকাশ করেন। এসময় বাদী আফম মহিতুল ইসলাম দুই হাত তুলে "বলেন আমাদের জয় হয়েছে।"

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ১২ আসামির ছবি

(১) খন্দকার আবদুর রশিদ (২) শরিফুল হক ডালিম (৩) এসএইচবিএম নূর চৌধুরী (৪) এএম রাশেদ চৌধুরী (৫) রিসালদার মোসলেমউদ্দিন (৬) আব্দুল মাজেদ

(৭) ফারুক রহমান (৮) মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যাঙ্গার) (৯) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান (১০) মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি) (১১) বজলুল হুদা (১২) মৃত আজিজ পাশা

২৭শে জানুয়ারি ২০১০ বুধবার রাত ১২টা পাঁচ মিনিট থেকে একটা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত দুজন-দুজন করে এবং শেষে একজনের সহ মোট পাঁচজনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। আজিজ পাশা পূর্বে মৃত। বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার ৫ খুনির ফাঁসি কার্যকর করেছেন ১২ জন জল্লাদ। কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনি সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলাতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ ল্যান্সার ও মুহিউদ্দিন (আর্টিলারি) দাফন নিজ নিজ গ্রামে সম্পন্ন হয়েছে।

সৈয়দ ফারুক রহমান: তার মরদেহ সকাল ১০ টায় নওগাঁ উপজেলার মারমা মল্লিকপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান: এর মরদেহ ব্রাহ্মনবাড়িয়া কসবার গোপনীনাথপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বজলুল হুদা বজলুল হুদার মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আমডাঙ্গা উপজেলার নগর বোয়ালিয়ায় দাফন করা হয়।

একে এম মহিউদ্দিন আহমেদ: এর মরদেহ গলাচিপার রাঙ্গাবালী ইউনিয়নের নেতা গ্রামে দাফন করা হয়।

আর্টিলারী মহিউদ্দিন: এর মরদেহ বড় বাইশদিয়া ইউনিয়নের নিজ কাটা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এদের প্রত্যেকের মরদেহ নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌছলে উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ দেখায়।

পলাতক ৬ আসামির ছবি

(১) খন্দকার আবদুর রশিদ

(২) শরিফুল হক ডালিম

(৩) এস এইচ বি এম নূর চৌধুরী

(৪) একে এম রাশেদ চৌধুরী

(৫) রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ও

(৬) আবদুল মাজেদ।

১৫ আগস্ট ভোর বেলায় বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদেরকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী হাবিলদার অবঃ কুদ্দুস সিকদারের মাননীয় আদালতে জবানবন্দির বিবরণ

হাবিলদার (অব:) কুদ্দুস সিকদার বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার রাষ্ট্র পক্ষের চার নম্বর সাক্ষী। তিনি ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাড়িতে কর্তব্যরত ছিলেন। তাঁর জবানবন্দি থেকে জানা যায়, মেজর শরিফুল হক ডালিম ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে সেকেন্ড কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। মেজর এবি এম ইলিয়াছ, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, ক্যাপ্টেন আবুল বাশার, সুবেদার মেজর আবদুল ওহাব জোয়ারদার ঐ ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি অফিসার ছিলেন, ঐ ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি কুমিল্লায় ছিল। ১৯৭৫ সালে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে মেজর শরিফুল হক ডালিমকে চাকুরি হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চাকুরি যাবার পর মেজর শরিফুল হক ডালিমকে ঐ আর্টিলারিতে দেখেন। ১৯৭৫ সালে জুলাই মাসের শেষের দিকে ওয়ান ফিল্ড রেজিমেন্ট হতে এক কোম্পানি রেজিমেন্ট ফোর্স ঢাকা বঙ্গ ভবনে এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে ডিউটির জন্য পাঠায়। ঐ কোম্পানিতে তিনিও ছিলেন। এবং ইতমধ্যে হাবিলদার পদে উন্নীত হন। ক্যাপ্টেন আবুল বাসারের নেতৃত্বে জুলাই মাসের শেষের দিকে তারা ঢাকা এসে গণভবনে পৌঁছে। ক্যাপ্টেন আবুল বাসার ডিউটি বণ্টন করেন। নায়েক সুবেদার আবুল মোতালেব, হাবিলদার আবদুল গনি, নায়েক আবদুল জলিল, সিপাহি সোহরাব হোসেন ও হাবিলদার কুদ্দুস শিকদার নিজে এবং কয়েকজন এন সিও সিপাইসহ ২৫ জনের একটি দলকে ধানমন্ডি ৩২ নং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ডিউটিতে পাঠায়। ধানমন্ডি ৩১ নং রোডে গার্ডদের জন্য নির্ধারিত একটি বাড়িতে ক্যাম্প করা হয়। সেখান হতে পালাক্রমে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ডিউটি করা হতো।

১৯৭৫ সালে ১৪ আগস্ট ভোর ৬টায় ডিউটি শেষ করে পরবর্তী হাবিলদার আবদুল গনিকে ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে ৩১নং বাড়িতে চলে যায়। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট রোজ শুক্রবার আনুমানিক ভোর পৌনে ৫টার সময় যথা সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পৌঁছেন এবং গার্ডরা বিউগলের সুরে সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে থাকে। এসময় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দক্ষিণে লেকের দিক হতে লাগাতার গুলি আসতে থাকে। তখন সকলসহ দেওয়ালের আড়ালে লাইন পজিশনে যান। গুলি বন্ধ হওয়ার পর পাল্টা গুলি করার জন্য পূর্ববর্তী গার্ড কমান্ডারের নিকট গুলি খোঁজাখোঁজি করতে থাকেন, এই সময় কালো ও খাকি পোশাকধারী সৈনিক হ্যান্ডস আপ বলতে বলতে গেটের মধ্য দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। তখন ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, মেজর নূর ও মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) কে গেটে দেখেন। তারপর ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বারান্দায় আসে সেখানে কামালকে দাঁড়ানো দেখিয়াই ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা হাতের স্টেনগান দ্বারা শেখ কামালকে গুলি করে। শেখ কামাল গুলি খেয়ে রিসিপশন রুমে পড়ে যায়। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা পুনরায় শেখ কামালকে গুলি করে হত্যা করে।

এরপর ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর বাড়ির পুলিশের ও কাজের লোকদের গেটের সামনে লাইনে দাঁড় করায়। অতঃপর মেজর মহিউদ্দিন তার ল্যান্সারের ফোর্স লয়ে গুলি করতে করতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দোতলার দিকে যায়। তারপর ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা মেজর নূর কয়েক জন ফোর্স লয়ে বাড়ির বারান্দা দিয়ে দোতলার দিকে যায়। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর সিঁড়ি দিয়ে চৌকির উপরে গেলে মেজর মুহিউদ্দিন ও তার সঙ্গীয় ফোর্স বঙ্গবন্ধুকে নিচের দিকে নামিয়ে আনে। এই সময় মেজর নূরের নির্দেশে মুহিউদ্দিন ও তার ফোর্স এক পাশে চলে যায়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "তোরা কী চাস" এর পরেই ক্যাপ্টেন হুদা ও মেজর নূর হাতের স্টেনগান দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়ির মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন বঙ্গবন্ধুর পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবী এক হাতে সিগারেটের পাইপ, অন্য হাতে দিয়াশলাই ছিল।

অতঃপর মেজর মুহিউদ্দিন, মেজর নূর, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাসহ নিচে নেমে এসে দক্ষিণ দিকে গেটের বাহিরে রাস্তায় চলে যায়। কিছুক্ষণ পর মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলে উদ্দিন ও ল্যান্সার ফোর্স এবং টু ফিল্ড আর্টিলারির ফোর্স গেটের সামনে আসে। তারপর মেজর আজিজ পাশা তার ফোর্স লয়ে গেটের

মধ্যে দিয়ে বাড়ির দোতলার দিকে যেতে থাকে। দোতলায় সুবেদার মেজর আবদুল ওয়াহাব জোয়ারদার ছিল। মেজর আজিজ পাশা তার ফোর্সসহ দোতলায় বঙ্গ বন্ধুর রুমের দরজা খোলার জন্য বলে। দরজা না খোলায় দরজায় গুলি করে। তখন বেগম মুজিব ভিতরে থাকা লোকদের না মারার জন্য কাকুতি মিনতি করেন। কিন্তু তাঁর কথা না রেখে একদল ফোর্স রুম হতে বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও একজন বাড়ির চাকরকে রুম হতে বের করে নিয়ে আসে। বেগম মুজিব সিঁড়ির নিকট এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এরপর বেগম মুজিবকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর বেড রুমে নিয়ে আসে। অতঃপর শেখ নাসের, শেখ রাসেল ও চাকরকে নিচে নিয়ে যায়।

মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মুসলেমুদ্দিন হাতের স্টেনগান দ্বারা বঙ্গবন্ধুর বেড রুমে থাকা সবাইকে গুলি করে। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ কামাল ও শেখ কামালের স্ত্রী ছিল। গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তারা নিচে চলে আসে। রিসিপশনের বাথরুমের মধ্যে শেখ নাসেরের লাশ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখেন। এরপর গেটের সামনে লাইনে সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশের লাশ দেখেন। তারপর মেজর আজিজ পাশা গেটের বাহিরে গিয়ে ওয়্যারলেসে কথাবার্তা বলে গেটের সামনে আসে, তখন শেখ রাসেল তার মায়ের কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি করছিল।

মেজর আজিজ পাশা ল্যান্সারের একজন হাবিলদারকে হুকুম দিল "শেখ রাসেলকে তাহার মায়ের কাছে নিয়া যাও" ঐ হাবিলদার শেখ রাসেলের হাত ধরে দোতলায় নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দোতলায় গুলির আওয়াজ ও কান্না কাটির চিৎকার শুনতে পান। তারপর ঐ হাবিলদার নিচে গেটের কাছে এসে মেজর আজিজ পাশা কে বলে "স্যার সব শেষ" এরপর গেটের সামনে একটা ট্যাংক আসে। মেজর ফারুক সাহেব ঐ ট্যাংক হতে নামিলে মেজর আজিজ পাশা, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা তার সহিত কথা বার্তা বলেন। তারপর মেজর ফারুক ট্যাংক নিয়ে চলে যান। কিছুক্ষন, পর একটা লাল কারে করে কর্নেল জামিলের লাশ বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভেতর নিয়ে যায়। একই সময় দোতলায় ভাঙ্গা-চুরার শব্দ শোনা যায়। তখন বাড়ির উত্তর পাশের সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে বঙ্গবন্ধুর রুমে যান, সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী এবং শেখ কামালের স্ত্রীর লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। একই রুমে শেখ রাসেলের চোখ ও মাথার মগজ বের হওয়া অবস্থায় তার লাশ দেখেন।

ফোর্সদেরকে মালামাল তছনছ করতে দেখা যায় এবং মূল্যবান মালামাল তাদের কাঁধের ব্যাগে ঢুকাতে থাকে।

একই সময় সুবেদার আবদুল ওহাব জোয়ারদার সাহেবকে রুমের ভিতর আলমারি হতে একটা ব্রিফকেস বেরকরে উহাতে কিছু স্বর্ণালংকার ও কিছু বিদেশি মুদ্রা ঢুকাতে দেখেন। রুমের ভিতর থাকা ফোর্স একটা ব্রিফকেস একটা রেডিও একটা টেলিভিশন নিয়ে নিচে নামিয়ে রাস্তার ধারে একটা জিপ গাড়িতে রাখে।

কিছুক্ষণ পর মেজর ফারুক সাহেব ও মেজর শরিফুল হক ডালিম সাহেব গেটের সামনে আসেন। তখন মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মুহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও সুবেদার মেজর আবদুল ওয়াহাব জোয়ারদার ও গেটের সামনে উপস্থিত ছিলেন। মেজর ফারুক সাহেব, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও সুবেদার মেজর আবদুল ওহাব সাহেবকে কাছে ডাকেন। কাছে ডেকে মেজর ফারুক সাহেব, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদার কাঁধের স্টার খুলে সুবেদার মেজর আবদুল ওয়াহাব সাহেবের হাতে দেন। এরপর মেজর সাহেব সুবেদার মেজর জুয়ারদারের কাঁধের শাপলা খুলে কাঁধে পরিয়ে দেন। এরপর মেজর ফারুক সাহেব সুবেদার মেজর আবদুল ওয়াহাব জোয়ারদার সাহেবের কাঁধে স্টার লাগিয়ে তাকে লেফটেন্যান্ট ডাকিলেন, তারপর সেখান হতে সব অফিসার চলে যায়।

যাবার সময় মেজর হুদা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পড়ে থাকা লাশ রক্ষণা-বেক্ষণসহ গোটা বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে যান। ৮ জন ঐ বাড়িতে ডিউটিতে থাকে। জুমার নামাজের পূর্বে ক্যাপ্টেন আবুল বাশার সাহেবকে গেটের সামনে দেখি তিনি মোহম্মদপুর শেরশাহ রোডের একটি কাঠের আড়তে নিয়ে যায়। সেখানে মেজর বজলুল হুদার কাঠের দোকানদারকে ১০টি লাশের কাঠের বাক্স বানিয়ে দিবার জন্য বলে এবং বাক্সগুলো বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং রোডস্থ বাড়িতে পৌছে দিতে বলে।

১৫ আগস্ট দিবাগত রাত্রে কাঠের আড়তদার ঠেলা গাড়িতে করে লাশের জন্য ১০টি কাঠের বক্স নিয়ে আসে। ফজরের আযানের পরে মেজর বজলুল হুদা আর্মির সাপ্লাই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ফোর্সসহ একটি গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসে। মেজর বজলুল হুদা, বঙ্গবন্ধুর লাশ বাদে বাকি লাশগুলো (৯টি) ঐ গাড়িতে করে নিয়ে যায়।

১৬ আগস্ট সকাল আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে একটি পিক আপে করে মেজর বজলুল হুদা সাহেব বঙ্গবন্ধুর লাশ বিমান বন্দরে নিয়ে যায়। এরপর একজন জেসিও এবং ৮/১০ জন সৈনিক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসে। তারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চলে যায়। ১৭ আগস্ট আনুমানিক সকাল ১০টার সময় বদলি গার্ড আসে। তাদেরকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সঙ্গীর গার্ড লয়ে গণভবনে চলে যান। পরের দিন অর্থাৎ ১৮ আগস্ট দিবাগত রাতে ঢাকা হতে ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে যোগদানের জন্য ক্যাপ্টেন আবুল বাশারসহ পুরাগার্ড কুমিল্লা চলে যায়। মেজর বজলুল হুদা যে ৯টি লাশ নেয় তন্মধ্যে কর্ণেল জামিল, শেখ নাসের, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা, শেখ জামালের স্ত্রী রোজি, বেগম মুজিবের লাশ ও এক জন পুলিশ অফিসারের লাশ ছিল।

আর্মিতে ৯টি কোর আছে। আরমারি কোরও একটি কোর, তাদের কালো ও ভার আল-কমবিনেশনের পোশাক ছিল। আর্টিলারিদের খাকি পোশাক ছিল। আরমার অথবা ল্যান্সার একই কোর।

সুবেদার মেজর ওয়াব জোয়ারদার সাহেব সাক্ষীর অফিসার ছিলেন। তিনি এখন কাঠগড়ায় আছেন (তাকে শনাক্ত করা হয়)। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় সেলিমের হাতে এবং পেটে দুটি গুলির জখম দেখতে পান, এরপর দেখতে পান কালো পোশাক পরিহিত আর্মিরা তাদের বাসায় সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ডিএসপি নরুল ইসলাম এবং পিএ রিসেপশনিস্ট মহিতুল ইসলামকে আহত দেখা যায়। এরপর বাসার সামনে একটা ট্যাংক আসে। ট্যাংক হতে কয়েকজন আর্মি নেমে ভিতরে আর্মিদের লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করে ভিতরে কে কে আছে। উত্তরে ভিতরের আর্মিরা বলে, "All are Finished" অনুমান ১২টার দিকে হাবিলদার (অবঃ) মোঃ কুদ্দুস সিকদারকে ছেড়ে দিবার পর তিনি প্রাণ ভয়ে গ্রামের বাড়ি টুঙ্গী পাড়া চলে যান।

এই জবান বন্দী একটি ইতিহাস হৃদয় স্পর্শী। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই বইয়ের মধ্যে প্রকাশ করা হলো। হাবিলদার (অব:) মোঃ কুদ্দুসের প্রতি রইল আন্তরিক সমবেদনা। তিনি বেছে আছেন বলেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সনাক্ত করা গেল।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর ঘটনার নিহতদের অবস্থা ও দাফন-কাফন

নৃশংসভাবে নিহত ১৮ জনের লাশ তিনটি বাড়ি ও হাসপাতালের মর্গ থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো দাফন করার এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক ঘটনার সম্পর্কে একটি স্মৃতি চারনা যা হৃদয় স্পর্শী। মেজর আলাউদ্দিন এর এই প্রতিবেদনটি যেন হারিয়ে না যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ এই বই এর মধ্যে প্রকাশ করা হলো। তিনি ১৯৯৯ই সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সিঁড়িতে পড়ে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ এর ১৬ আগস্ট রাত তিনটায় ঢাকা সেনা নিবাসের ষ্টেশন কমান্ডারের আদেশে মেজর আলাউদ্দিন (বর্তমানে প্রয়াত) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে যান। স্টেশন কমান্ডার আগেই পৌঁছে গিয়ে ছিলেন। মেজর বজলুল হুদা ও তাঁর লোকজন পাহারা দিচ্ছিলেন বাড়িটি। হুদা প্রথমে তাকে বাধা দিলেও পরে ঢুকার অনুমতি দেন।

৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ি:

সবগুলো লাশ সিঁড়ির গোড়ায় আনা হলো। রাখা হলো কাঠের কফিনে। বরফ আনা হয়েছিল। রক্ত, মগজ ও হাড়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। প্রথম তলার দেয়াল জানালার কাঁচ, মেঝে ও ছাদে। বাড়ির সব বাসিন্দাকেই খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলির আঘাতে দেয়ালগুলোও ঝাঁঝরা হয়ে যায়। খোসাগুলো মেঝেতে পড়া ছিল। কয়েকটি জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়। চার-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ঘরের জিনিসপত্র, গিফট বক্স ও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিয়ের উপহারের প্যাকেট, পবিত্র কোরআন শরিফও মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, ঘাতকের গুলিতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারসহ আরও যারা নিহত হয়েছেন

(১) বেগম মুজিব (২) শেখ রাসেল (৩) আবদুর রব সের নিয়াবাত (৪) শেখ ফজলুল হক মনি

(৫) বেগম আরজু মনি (৬) বেবী সের নিয়াবাত (৭) শেখ কামাল (৮) সুলতানা কামাল

(৯) শেখ জামাল (১০) পারভীন জামাল (রোজী) (১১) আরিফ সের নিয়াবাত (১২) সুকান্ত আব্দুল্লাহ্

(১৩) শেখ আবু নাসের (১৪) কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদ (১৫)) শহীদ সের নিয়াবাদ (১৬) আবু নায়েম খান নিটু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়িতে ৯ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। লাশগুলো মেজর আলাউদ্দিনের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী যে অবস্থায় ছিলঃ বাড়ির সব বাসিন্দা কেই খুব কাছ থেকে হত্যা করা হয়, এবং দেখে তার মনে হয়েছে তাঁদের সবাই তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ হারায়।

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবঃ

প্রথম তলার সিঁড়ির মাঝখানে। যে সমতল অংশটি তার তিন চার ধাপ ওপরে। একেবারে কাছ থেকে গুলি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে খুন করা হয়। তাঁর তলপেট, বুক ছিল বুলেট ঝাঁঝরা। বঙ্গবন্ধু সব সময় চশমা পরতেন এবং তাঁর ধুমপানের অভ্যাস ছিল। তাঁর চশমা ও তামাকের পাইপটি সিঁড়িতে পড়া ছিল। পরনে চেক লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি, চশমার একটি গ্লাস ভাঙা, রক্তে পাঞ্জাবির রং ছিল গাড় লাল, একটি বুলেট তাঁর ডান হাতের তর্জনীতে গিয়ে লাগে এবং আঙুলটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(২) বেগম মুজিবঃ

বেগম মুজিবকে বুকে ও মুখ মন্ডলে গুলি করা হয়। তাঁর পরনে ছিল সুতি শাড়ি এবং কালো রঙ্গের ব্লাউজ, গলায় মাদুলি বাঁধা একটি সোনার নেকলেস। কনিষ্ঠা আঙ্গুলে ছোট্ট একটি আংটি, তখন তাঁর পায়ে ছিল একটি বাথরুম স্লিপার।

(৩) শেখ কামালঃ অভ্যর্থনা কক্ষে, বুক ও তল পেটে তিন থেকে চারটি বুলেট বিদ্ধ হয়। তাঁর পরনে ছিল ট্রাউজার। নিচ তলায় তাঁকে খুন করা হয়।

(৪) টেলিফোন অপারেটরঃ

অভ্যর্থনা কক্ষে, নিচ তলায় তাঁকে খুন করা হয়।

(৫) শেখ নাসেরঃ

শেখ নাসেরকে খুন করা হয় রাথরুমের কাছে, তাঁর হাত উড়ে গিয়েছিল, গুলিতে দেহের বেশ কিছু স্থান ছিল ক্ষত-বিক্ষত, তাঁর গায়ে কোনো পোশাক ছিল না। এবং লাশ বিছানার চাদরে মোড়ানো ছিল।

(৬) সুলতানা কামালঃ

সুলতানা কামালের বুক ও তলপেটে গুলি লাগে। পরনে ছিল শাড়ি ও ব্লাউজ।

(৭) শেখ জামালঃ

শেখ জামালের মাথা চিবুকের নিচ থেকে উড়ে গিয়েছিল। পরনে ট্রাউজার। ডান

হাতের মধ্যে আঙুলের মাথায় ছিল একটি মুক্তার আংটি সম্ভবত এটি ছিল তাঁর বিয়ের আংটি।

(৮) রোজী জামাল:
তাঁর মুখটি দেখাচ্ছিল বিবর্ণ মলিন। মাথার একাংশ উড়ে গিয়েছিল। তাঁর তল পেটে, বুক ও মাথায় গুলি করা হয়। পরনে ছিল শাড়ি ও ব্লাউজ।

(৯) শিশু রাসেল:
সম্ভবত আগুনে তার পা ঝলসে যায়। মাথা উড়ে গিয়েছিল। পরন ছিল হাফ প্যান্ট। লাশ একটি লুঙ্গিতে মোড়ানো ছিল।

মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো ছিল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জামাল ও কামালের বিয়ের অনেক উপহার সামগ্রী এবং গিফট প্যাকেট, কিছু বাক্স ছিল ফাঁকা। কামালের কক্ষে রূপার তৈরি অনেক জিনিসপত্র দেখা যায়। সিঁড়িতে ছিল আল্পনা আঁকা। অভ্যর্থনা কক্ষটি ছিল নোংরা। মেজর আলাউদ্দিন ওপর তলা থেকে শুনতে পান নিচতলায় হুদা চিৎকার করছেন তিনি এ বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র চুরি করায় কয়েকজন সিপাহিকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

ধানমন্ডি শেখ মনির বাড়ি সড়ক নং ১৩/১:
মনি ও তাঁর সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে তাঁদের এই বাড়িতে খুন করা হয়। তাঁদের বাড়ির দিকে "সেনা বাহিনীর গাড়ি" আসতে দেখে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব ছেড়ে সরে যান। বাড়িটি ছিল আংশিক তছনছ করা। মেঝেতে স্পষ্ট রক্তের দাগ। মাঝের টেবিলে একটি অ্যালমিনিয়ামের বাটিতে কিছু ভিজানো চিড়া।

আব্দুর রব সের নিয়াবাতের বাড়ি:
মন্ত্রীর বাড়িটি ছিল ফাঁকা ড্রয়িং রুমে দেখা গেল জমাট বাঁধা রক্ত। বাড়ির নিরাপত্তা পুলিশ আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। সের নিয়াবাত ও শেখ মনি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়। লাশগুলো ছিল বিকৃত। তারপরও আদ্রতা লাশের ক্ষতি করে। লাশ থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। বনানী গোরস্থানে দাফনের জন্য লাশগুলো সেনা নিবাসে নিয়ে আনা হলো। বঙ্গবন্ধুর লাশ ছাড়া ৩২ নম্বর সড়কের অন্য সবার লাশ ও আরেকটি ট্রাকে করে সেখানে আনা হয়।

দাফন-কাফন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

(১) মৃতদেহ সংগ্রহ :

১৫ আগস্ট ঘটনায় নিহতদের লাশ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়ক এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়। দুটি ট্রাকে করে ১৮টি লাশ দাফনের জন্য আনা হয়। বনানী গোরস্থানে দাফনের জন্য গুলশান মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অনুমতি নেওয়া হয়। এএসসি (আর্মি সার্ভিসেস কোর) সিপাহীদের একটি প্লাটুন গোর খোদকের কাজ করে। স্টেশন কমান্ডার আগেই বলে ছিলেন ১৬ আগস্টের দিনের প্রথম আলো ফোটার আগেই যাতে দাফনের সব কাজ শেষ হয়ে যায়।

(২) দাফন :

আগস্ট মাসের তাপ আদ্রতার কিছু লাশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে কোনো ফ্যান ছিল না। ৩২ নম্বরের লাশগুলোতে বরফ দেওয়া ছিল। ফলে সেগুলোর অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো সিপাহিদের কয়েকজন ছিল, খুবই গলা ছড়িয়ে কথা বলছিল। শেখ মুজিব বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করছিল তারা। ফলে গোটা পরিস্থিতিই সতর্কতার সাথে সামাল দিতে হয়। অবশ্য কোন লাশেরই যাতে অমর্যদা না হয় সেটা নিশ্চিত করেছেন। সিপাহীদের কয়েকজন কবর খুঁড়তে অনীহা প্রকাশ করে। লাশের খারাপ অবস্থার কারণে, কয়েকজন এমনকি ছুঁতে পর্যন্ত রাজি ছিল না। নিজে প্রথম বেগম মুজিবের মৃত দেহটি ওঠান এবং চির শয্যায় শায়িত করেন। শেখ নাসেরের দেহাবশেষ একই ভাবে দাফন করেন। এরপর আর সমস্যা হয়নি। কারণ সূর্যোদয়ের আগেই সব সেরে ফেলার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন। গোরস্থানমুখী সড়কগুলো আগেই সিপাহি মোতায়েন এবং গোরস্থান এলাকায় "কারফিউ" জারি করা হয়। ভোরে ঘুম ভাঙা কিছু লোক ও পথচারী কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করলে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়।

৩) অনির্দিষ্ট কালের জন্য গোরস্থানটি দাফন কাজ বন্ধ :

সাত নম্বর সারির চার পাশে বেড়া দেওয়া হয় এবং অস্থায়ী চৌকি বসিয়ে ২৪ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। আনির্দিষ্টকালের জন্য গোরস্থানটি দাফন কাজ বন্ধ ও দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

৪) মৃতদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র :
কয়েক টি লাশের সঙে কিছু গয়না পাওয়া যায়। একটি তালিকা তৈরি করে গয়নাগুলো স্টেশন কমান্ডারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দাফন :
১৬ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধুর লাশ সেনা বাহিনীর একটি ট্রাকে করে ক্যান্টমেন্টে আনা হয়। কাফন কেনা হয় সিএসডি (ক্যান্টিন ষ্টোরস ডিপার্টমেন্ট) থেকে। এটি কেনা হয়েছিল বাকিতে। অর্ডিন্যান্সের জিডিও (গ্যারিসন ডিউটি অফিসার) মেজর মহিউদ্দিন আহমেদকে লাশের সঙে টুঙ্গি পাড়া যাওয়ার খুঁটি-নাটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। একটি বিএএফ (বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স) হেলিকপ্টারের লাশ দাফনের জন্য টুঙ্গিপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতুদেহের গোসল ও জানাজা দেওয়া হয়।

জানাজায় বঙ্গবন্ধুর চাচাসহ ডজন খানেক লোক শরিক হয়। একটি অস্থায়ী চৌকি বসিয়ে কবরটি পাহারার জন্য রক্ষী মোতায়েন করা হয়। জিডিও টুঙ্গি পাড়া থেকে ফিরে সদর দপ্তরের মিলিটারি অপারেশন ডিরেক্টরের কাছে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।

৬। নিহতদের বাড়িগুলো সিল করা হয় :
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, শেখ মনি ও শেরনিয়া বাতের বাড়ি তালা বদ্ধ করে সিল গালা করা হয়। এবং চাবি স্টেশন সদর দপ্তরে রাখা হয়।
৭। অনেক বাধা বিপত্তি ও সিমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধ্যমতো সর্বোচ্চ যত্ন ও মর্যাদার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

বনানী গোবরস্থান সাত নম্বর সারিতে যাঁদের কবর দেওয়া হয় :
(১) বেগম মুজিব (২) শেখ নাসের (৩) শেখ কামাল (৪) সুলাতানা কামাল (৫) শেখ জামাল (৬) রোজী জামাল (৭) শিশু রাসেল (৮) অজ্ঞাত পরিচয় ১০ বছর বয়সী একটি বালক (৯) ফাকা (১০) অজ্ঞাত পরিচয় ১২ বছর বয়সী একটি বালক (১১) গৃহ পরিচারিকা, বয়স ৪৫ (১২) অজ্ঞাত পরিচয় ১০ বছর বয়সী ফুটফুটে বালিকা (১৩) শেখ মনি (১৪) মিসেস মনি (১৫) অজ্ঞাত পরিচয় ২৫ বছর বয়সী এক যুবক (১৬) অজ্ঞাত পরিচয় ১২ বছর বয়সী একটি বালক (১৭) আবদুর রব সের নিয়া বাত (১৮) অজ্ঞাত পরিচয় ২৫ বছর বয়সী এক যুবক।
বিঃ দ্রঃ ৯ নম্বর কবরের নঈমখানের লাশ লেঃ আবদুস সবুর খানের (এনও) কে

কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। নৃশংভাবে নিহত ১৮ জনের লাশ তিনটি বাড়ি ও হাসপাতালের মর্গ থেকে সংগ্রহ করে। সেগুলো দাফন করার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর তৎকালীন মেজর আলাউদ্দিন আহমেদ পিএসসি। তার দেওয়া উপরোক্ত প্রতিবেদন একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা পড়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারবে কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বাদী মহিতুল ইসলাম, রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌসুলি আনিসুল হক এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।
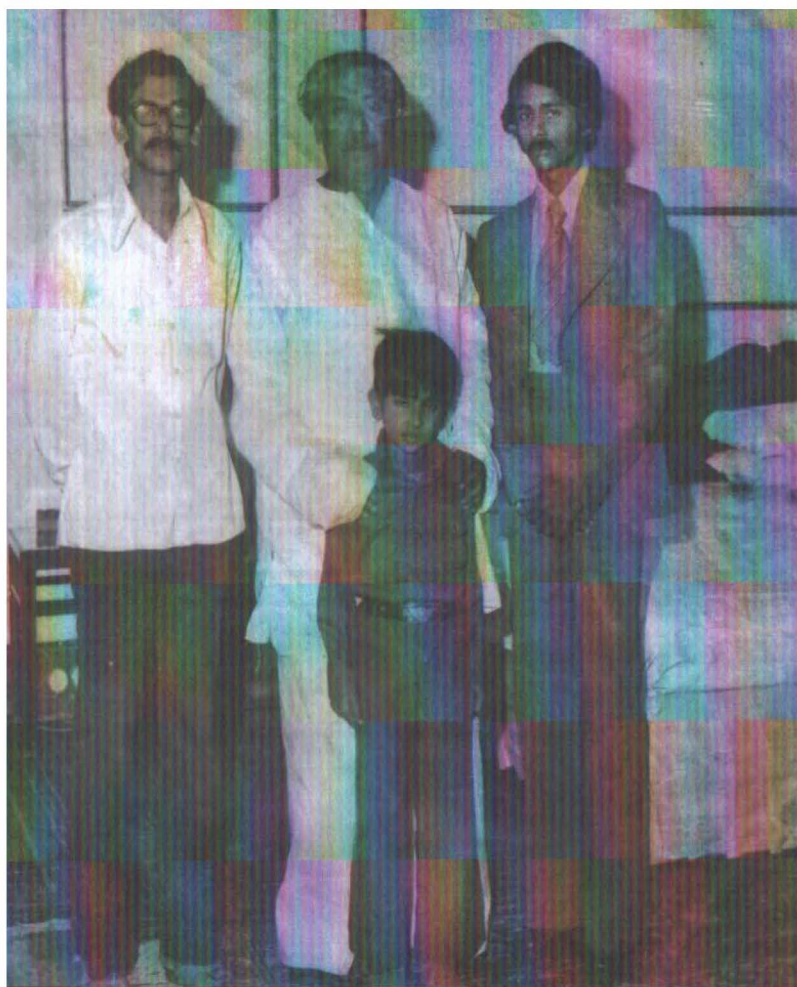
তিন সন্তানের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

পারিবারিক পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসে-১৯৭১।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন সমুদ্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
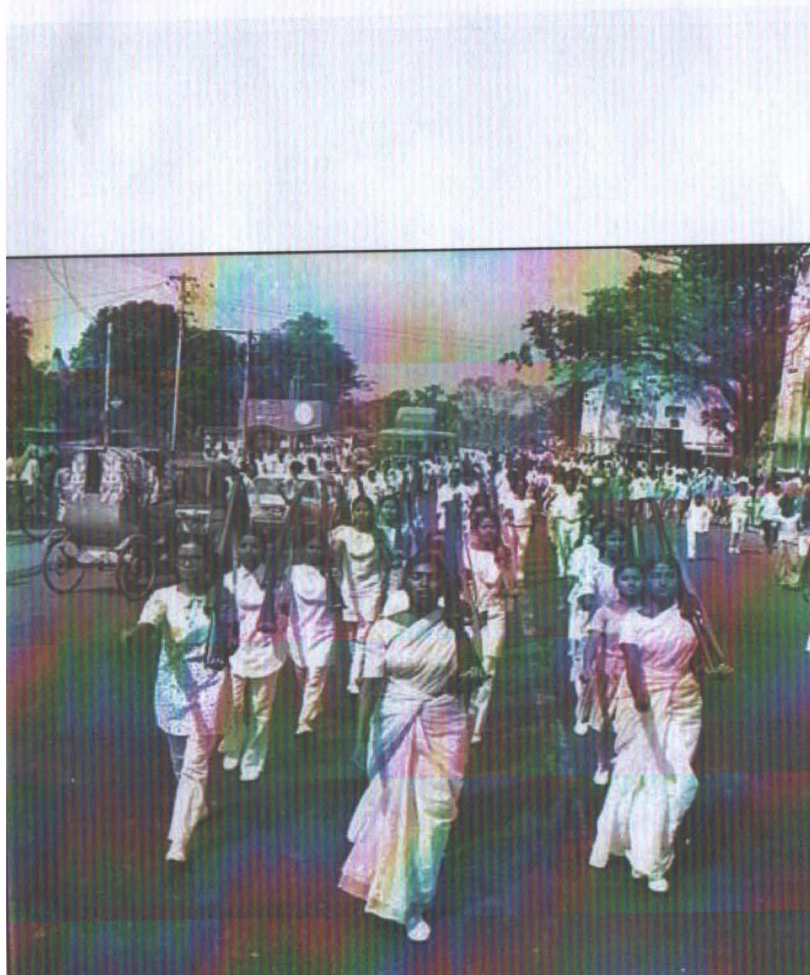
আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা ট্রাইব্যুনালে যাবার পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তে জাতির জনক ও তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নোয়াখালী সফরকালীন গার্ড অফ অনার গ্রহণ করিতেছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

মতামত

"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব" বইটি জাতির ইতিহাসের হাল ধরেছে। এটি যুগ যুগ ধরে প্রজন্মকে ইতিহাস জানাবে। এই মহতি কাজের জন্য মো: মোজাম্মেল হোসেন খন্দকারকে অভিনন্দন জানাই। বইটিতে সকল ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ায় নতুন প্রজন্ম বইটি পড়তে ও সংগ্রহ করতে উৎসাহ বোধ করবে।

খন্দকার ইসমাইল (টিভি উপস্থাপক)
সিইও, ডায়না এ্যাডভারটাইজম্যান্ট
৬৯/০ পূর্ব পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।

"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব" বইটিতে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ও বাকশাল কর্মসূচির কিছু অংশ এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে জাতির জনক ও তাঁর স্ত্রী স্বজন এবং সহকর্মীরা দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে কিভাবে প্রাণ দিয়েছেন সেই নির্মম কাহিনী বইটিতে ধারণ করা হয়েছে। একজন মহান নেতা ও জাতির পিতার জীবনাদর্শকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই বইটি অমর গ্রন্থ হিসেবে বেঁচে থাকবে। বইটি বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন এবং স্কুল কলেজ পর্যায়ে লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক।

ডাঃ ফয়েজ আহমদ খন্দকার
সহকারী অধ্যাপক, লিভার বিভাগ
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ঢাকা।

বাংলাদেশের ইতিহাসের কিছু অংশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এই বইটিতে খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছে। আমরা নতুন প্রজন্ম এই বইটির মাধ্যমে খুব সহজেই মুক্তিযুদ্ধকে উপলদ্ধি করতে পারব।

রিফাত খন্দকার
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (দ্বিতীয় বর্ষ)
আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব" বইটিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তারিখসহ বইটিতে স্থান পেয়েছে। আমি মনে করি বর্তমান প্রজন্মের প্রত্যেকের বইটি পড়া ও সংগ্রহে রাখা উচিত।

মোঃ আব্দুল মান্নান
সিনিয়র অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
ওয়াসা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

বাঙালীর ইতিহাসের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার কাজে এই গ্রন্থটির লেখনি এবং লেখকের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

ডাঃ মাহমুদা খন্দকার
ক্লিনিক্যাল ফেলো
আই,সি,ডি,ডি,আর,বি
ঢাকা।